প রি চ য়

বিশেষ সমালোচনা সংখ্যা

আগামী শ্রাবণে পরিচয় ৩৩ বর্ষে পা দেবে। এই উপলক্ষে অন্যান্য বছরের মত এবারও শ্রাবণ সংখ্যা পরিচয় বিশেষ সমালোচনা সংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে। নির্বাচিত দেশী বিদেশী বইয়ের বিস্তৃত সমালোচনার মধ্য দিয়ে দেশ বিদেশের সাম্প্রতিক সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির একটা আভাস দেবার চেষ্টা করা হবে এই সংখ্যায়। বাংলাদেশের বিশিষ্ট সমালোচক ও সুধীবৃন্দ এই ব্যাপারে পরিচয়-এর সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। বিস্তৃত বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

এজেণ্টরা অগ্রিম চাহিদা জানান
গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য অতিরিক্ত
মূল্য দিতে হবে না

নিয়মিত পরিচয় পেতে হলে গ্রাহক
হওয়াই শ্রেয়

চাঁদা : বার্ষিক ১০৲ টাকা, ষাণ্মাসিক ৫·৫০

দাম : এক টাকা



প্রচ্ছদ

পূর্ণেন্দু পত্রী

সম্পাদক

গোপাল হালদার । মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।



সংবাদপত্র : ময়না তদন্ত

আদিত্যপ্রসাদ চৌধুরী

বিলেতের সংবাদপত্র-জগত সম্পর্কে লেবরপন্থী ডেইলি হেরল্ডের প্রাক্তন সম্পাদক স্যার ফ্রান্সিস উইলিয়মস্-এর যে গ্রন্থটি কিছুকাল আগে প্রকাশিত হয়েছে তার নামটি ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ—'ডেঞ্জারাস এস্টেট'। স্যার ফ্রান্সিসের বইটি ছিল বিলেতের সংবাদপত্র জগতে মনোপলির বিকাশ সম্পর্কে। তিনি দেখিয়েছিলেন বিলেতে একদিকে যেমন সংবাদপত্রের পাঠকসংখ্যা চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে গেছে অন্যদিকে তেমনি সংবাদপত্রের সংখ্যা কমে এসেছে। অবস্থা দৃষ্টে স্যার ফ্রান্সিস ক্ষুব্ধ মন্তব্য করেছিলেন : 'We read more and more copies of fewer and fewer newspapers.'—আমরা ক্রমশ বেশি বেশি সংখ্যায় কম সংখ্যক খবরের কাগজ পড়ছি।

স্যার ফ্রান্সিস দেখিয়েছিলেন এই অবস্থার জন্য দায়ী এক ধরনের মাৎস্য ন্যায়। বড় বড় কাগজগুলি ছোট কাগজগুলিকে গ্রাস করছে, ফলে পাঠকের বেছে নেবার স্বাধীনতা সংকুচিত হচ্ছে। আর মালিকের শক্তিবৃদ্ধির অনুপাতে ক্ষুন্ন হচ্ছে সাংবাদিক ও সম্পাদকের স্বাধীনতাও। ফোর্থ এস্টেটের এই অবস্থাকেই স্যার ফ্রান্সিস বর্ণনা করেছেন 'ডেঞ্জারাস এস্টেট' বলে।

এই বর্ণনা হুবহু হয়ত ভারতবর্ষের সংবাদপত্রজগত সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। বিলেতের প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার শতকরা প্রায় একশ জনই এক বা একাধিক খবরের কাগজ পড়ে থাকেন। সে দেশের খবরের কাগজের তাই ভালো বা মন্দ করার ক্ষমতা অনেক বেশি। আমাদের দেশে এই অবস্থা এখনও অকল্পনীয়। বিলেতের বড় বড় কাগজগুলির তুলনায় আমাদের দেশের বড় কাগজগুলির প্রচার সংখ্যা নগণ্য। এদেশে শতকরা মাত্র তেত্রিশ জন লোক কোনো রকমে নিজের নাম সই করতে পারে, খবরের কাগজ পড়তে

পারে এবং পড়ে তারও এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। কাজেই এদেশের সংবাদপত্রের ভালো এবং মন্দ করার ক্ষমতা দুই-ই অনেক পরিমাণে সীমাবদ্ধ। এবং ছোট কাগজকে গ্রাস করে বড় কাগজের আরও বড় হবার দৃষ্টান্তও হয়ত এদেশে বিরল। তবু, যে-সব দুর্লক্ষণের প্রতি স্যার ফ্রান্সিস তার বইতে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন তার অনেকগুলিই এদেশের সংবাদপত্রজগতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং এক হিসেবে ভারতবর্ষের ফোর্থ এস্টেটের অবস্থা আরও বেশি বিপজ্জনক।

॥ দুই ॥

বিলেতের সংবাদপত্রজগতে মনোপলির বিকাশ যে ধারায় হয়েছে ঠিক সেই ধারায় না হলেও একথা আজ আর অস্বীকার করবার উপায় নেই যে খবরের কাগজের মালিকানা ক্রমশ ক্রমশ কম সংখ্যক হাতে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে।

ভারতীয় সংবাদপত্রজগতের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্য বিগত দশকে সরকার একটি প্রেস কমিশন নিযুক্ত করেছিলেন। এই কমিশন ১৯৫৪ সালে প্রদত্ত তাঁদের রিপোর্টে বলেছিলেন : "There can, therefore, be no denying the fact that there *already exists* in the Indian newspaper industry a *considerable degree of concentration.* We feel that there is a danger that this tendency might further *develop* in the near future." (বাঁকা হরফ লেখকের) অর্থাৎ, ভারতীয় সংবাদপত্রজগতে মালিকানা এখনই বহুল পরিমাণে কেন্দ্রীভূত এবং অদূর ভবিষ্যতে তা আরও কেন্দ্রীভূত হবার আশঙ্কা রয়েছে।

কমিশনের এই সতর্কবাণী কার্যত উপেক্ষিত হয়েছে। মনোপলির বিকাশ রোধ করবার জন্য কমিশন যে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করেছিলেন তা কাগজে-কলমেই থেকে গেছে। প্রেস রেজিষ্ট্রার অবশ্য নিয়োগ করা হয়েছে, সংবাদপত্রগুলিকে মালিকানা ঘোষণা করতে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু প্রেস কাউন্সিল, প্রেস কমিশন যার কর্তব্য নির্দেশ করেছিলেন এই বলে—"মনোপলির অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান চালান, দেখা তা জনস্বার্থবিরোধী কাজ করছে কি না, প্রতিযোগিতা দূর করবার জন্য অবাঞ্ছনীয় কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে কিনা এবং এ সম্পর্কে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন কিনা এবং প্রয়োজন হলে সে সম্পর্কে সুপারিশ করা"—তা অদ্যাবধি গঠন করা

হয় নি। ফলে, ১৯৫৪ সালে প্রেস কমিশন যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছে।

১৯৫৪ সালে প্রেস কমিশন তাদের রিপোর্টে দেখিয়েছিলেন ২২টি বৃহৎ সংবাদপত্র আছে যার প্রত্যেকটির প্রচার সংখ্যা সারাভারতের সমস্ত সংবাদপত্রের মোট প্রচার সংখ্যার শতকরা এক ভাগের বেশি। প্রেস কমিশন দেখিয়েছিলেন এই বাইশটি পত্রিকা সমস্ত সংবাদপত্রের মোট প্রচার সংখ্যার ৫৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রন করে। প্রেস কমিশন এই সিদ্ধান্ত করছিলেন ১৯৫২ সালের তথ্যের ভিত্তিতে।

কিছুকাল আগে প্রেস রেজিষ্ট্রারের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬০ সালের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত এই রিপোর্টে দেখা যাবে সংবাদপত্র জগতের সামগ্রিক অবস্থা হরে-দরে এক থাকলেও কোনো কোনো বিশেষ মালিক গোষ্ঠীর প্রভাব আরও স্ফীত হয়েছে।

১৯৫২ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে (ক' শ্রেণীর) সংবাদপত্রের মালিকানা কি পরিমাণ কেন্দ্রীভূত হয়েছে তার আভাস পাওয়া যাবে ১নং তালিকায়।

এই তালিকা থেকে ১২টি সংবাদপত্র মালিকানার অবস্থা বোঝা যাবে। এরা প্রত্যেকেই সারা ভারতবর্ষের সমস্ত সংবাদপত্রের সর্বমোট প্রচার সংখ্যার ১.১ শতাংশ নিয়ন্ত্রন করে।

নিয়ন্ত্রন, ব্যবস্থাপনা ও প্রচার সংখ্যার দিক দিয়ে বিবেচনা করলে দেখা যাবে এই ১২টি সংবাদপত্র মালিকানা সংবাদপত্র শিল্পের অর্ধাংশের উপর প্রভুত্ব করে। ১৯৫২ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে একমাত্র আনন্দবাজার ও বিশ্বামিত্র গোষ্ঠী ছাড়া প্রত্যেকেরই তাদের মালিকানাভুক্ত সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

২নং তালিকা থেকে দেখা যাবে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের উপর এই মালিকগোষ্ঠীর কর্তৃত্ব কতটা কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

ফোর্থ এস্টেটের অবস্থা যে কতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে ২নং তালিকা থেকে তার কতকটা আভাস পাওয়া যাবে। ১৯৪২ সালে ১২টি মালিকগোষ্ঠীর মধ্যে ৯টি গোষ্ঠী ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত সব কটি দৈনিকের সর্বমোট প্রচার সংখ্যার ৭৮ শতাংশ নিয়ন্ত্রন করত। ১৯৬০ সালে দেখা যাচ্ছে ৯টির মধ্যে আটটি মালিকগোষ্ঠী সবকটি ইংরেজী দৈনিকের সর্বমোট প্রচার সংখ্যার ৮৩.৮ শতাংশ নিয়ন্ত্রন করে। নবম মালিক গোষ্ঠী (বিশ্বামিত্র-মালিক অগ্রবাল) তাদের একমাত্র ইংরেজী দৈনিক 'অ্যাডভান্স'-এর প্রকাশ বন্ধ করে দিতে

১ নং তালিকা

ক্রমিক নং নাম	মালিকানা*		পত্রিকার সংখ্যা†		সংখ্যা		প্রচার সংখ্যা শতাংশ	
	ধরন	চরিত্র‡	১৯৫২	১৯৬০	১৯৫২	১৯৬০	১৯৫২	১৯৬০
১। গোয়েঙ্কা (এক্সপ্রেস)	কোং	চে	৮	১০	২,৩২,২৭৪	৪,৪৬,০২১	৯.২	৯.৭
২। ডালমিয়া-জৈন	কোং	চে	৭	৫	১,৪৪,২৫৮	২,৬৯,৮৮৭	৫.৭	৫.৯
৩। অমৃতবাজার পত্রিকা	কোং	চে	৪	৩	১,৬৬,৬৪৬	১,৯৭,০৪৭	৬.৬	৪.৩
৪। বিড়লা	কোং	চে	৭	৭	১,০২,৬৭৩	১,৭৩,০৬১	৪.১	৩.৮
৫। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল প্রেস	কোং	গ্রু	৪	৪	৭৮,৩৭২	১,৪২,২৫৯	৩.১	৩.১
৬। আনন্দবাজার পত্রিকা	কোং	চে	৩	২	১,৪১,৪৯৮	১,২৭,৬৫১	৫.৬	২.৮
৭। আদিত্যান	ব্যক্তি	মা.ই	২	৩	৩০,৭০২	১,৪২,১৯৯	১.২	৩.১
৮। কস্তুরী অ্যাণ্ড সন্স (হিন্দু)	কোং	চে	১	১	৬৫,৬৫০	১,২০,৮৬৬	২.৬	২.৬
৯। স্টেটসম্যান	কোং	মা.ই	২	২	৬৫,০৩২	১,০৯,৭৪৯	২.৬	২.৪
১০। অগ্রবাল (বিশ্বামিত্র)	পা+কোং	চে	৬	৪	৫২,৬৯২	৬৪,৫৫৪	২.১	১.৩
১১। সকল	কোং		১	১	২৭,৫০০	৫৩,১১২	১.১	১.২
১২। মহারাষ্ট্র	কোং	গ্রু	×	৩	×	৫১,৬৩০	×	১.১
মোট			৪৫	৪৫	১১,০৭,২৯৭	১৮,৯৮,১৩৬	৪৩.৯	৪১.৩
সমস্ত 'ক' শ্রেণীর পত্রিকার সর্বমোট			৩৩০	৩১৩	২৫,২৫,০০০	৪৬,১০,০০০	১০০.০	১০০.০

* কোং—কোম্পানী, পা—পার্টনারশিপ।
† যে পত্রিকাগুলি একাধিক কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত হয় তার সংখ্যা গণনা করা হয়েছে প্রত্যেকটি কেন্দ্রকে স্বতন্ত্র এক ধরে।
‡ চরিত্র নির্ণয় করা হয়েছে প্রেস রেজিষ্ট্রারের সংজ্ঞা অনুসারে।
চে : চেন : একই মালিকানায় একাধিক কেন্দ্র থেকে একাধিক পত্রিকা প্রকাশনা।
গ্রু : গ্রুপ : একই কেন্দ্র থেকে একই মালিকানায় একাধিক পত্রিকা প্রকাশনা।
মা.ই : মালটিপল ইউনিট : একই নামে একাধিক কেন্দ্র থেকে একই ভাষায় একই মালিকানায় একাধিক পত্রিকা প্রকাশনা।

২ নং তালিকা

ক্রমিক নং নাম	সর্বমোট প্রচার সংখ্যার শতাংশ: ইংরেজী ১৯৫২	ইংরেজী ১৯৬০	হিন্দী ১৯৫২	হিন্দী ১৯৬০	বাংলা ১৯৫২	বাংলা ১৯৬০	তামিল ১৯৫২	তামিল ১৯৬০	তেলেগু ১৯৫২	তেলেগু ১৯৬০	মারাঠী ১৯৫২	মারাঠী ১৯৬০
১। গোয়েঙ্কা	৮.০	১৮.০	৩.০	×	—	—	৩৯.০	২০.০	৫৫.০	৩৪.৭	২৩.০	২৩.৩
২। ডালমিয়া জৈন	১৫.০	১৫.০	৭.০	১৩.৪	৫.০	×						
৩। অমৃতবাজার	১১.০	৯.৩	৩.০	×	৩৪.০	৪২.৭						
৪। বিড়লা	১০.০	৮.৮	৯.০	৯.৭								
৫। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল প্রেস	৭.০	৯.০									১৪.০	৯.০
৬। আনন্দবাজার	৮.০	৩.৬			৩৭.০	৪১.৬						
৭। আদিত্যান							১৯.০	৩০.০				
৮। কস্তুরী অ্যাণ্ড সন্স	৯.০	১০.৫										
৯। অগ্রবাল	১.০	×	১৩.৭	৮.৭								
১০। স্টেটসম্যান	৯.০	৯.৬										
১১। সকল											১৫.০	১৫.২
১২। মহারাষ্ট্র											×	১৪.৮
মোট	৭৮.০	৪৩.৮	৩৫.০	৩১.৮	৭৬.০	৮৪.৩	৫৮.০	৫০.০	৫৫.০	৫৫.০	৫২.০	৬২.৩
'ক' শ্রেণীর সমস্ত পত্রিকার সর্বমোট প্রচার সংখ্যা, লক্ষের হিসাবে	৬.৯৭	১১.৫০	৩.৭৯	৭.৪৫	২.৪০	২.১০	১.৬৮	৪.৮৭	০.৯৮	১.৬৪	১.৯১	৩. ৯
'ক' শ্রেণীর দৈনিকের মোট সংখ্যা	৪১	৩৪	৭৬	৭৫	৭	৫	১২	২০	৬	১২	২৬	২৪
১২ মালিকগোষ্ঠীর কর্তৃত্বাধীন পত্রিকার সংখ্যা*	২০	২০	১৩	৯	৩	২	৪	৫	১	২	৩	৬

* একমাত্র ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল প্রেস প্রকাশিত গুজরাটি দৈনিক জনশক্তিকে এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।
× চিহ্নের অর্থ পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে বা প্রচার সংখ্যা এক শতাংশের নিচে নেমে গেছে।

বাধ্য হয়েছেন। এবং এইভাবে তাঁরা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে গেছেন।

বাংলাভাষায় প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্রের দিকে তাকালেও একই ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সেখানে আনন্দবাজার ও অমৃতবাজার পত্রিকার মালিকগোষ্ঠী এমন কি ডালমিয়া-জৈনের মতো প্রবল পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকেও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র থেকে নির্মূল করে ছেড়েছেন, অন্য পরে কাঃ কথা। ১৯৫২ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে এই দুটি মালিকগোষ্ঠী প্রকাশিত বাংলা দৈনিক পত্রিকা দুটি তাদের প্রচার সংখ্যা বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত দৈনিক পত্রিকার সর্বমোট প্রচার সংখ্যার ৭১ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৮৪ শতাংশ করতে সমর্থ হয়েছেন। বলা বাহুল্য, এর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ছোট কাগজগুলি। অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে গত এক দশকে একাধিক বাংলা দৈনিক পত্রিকাকে পাততাড়ি গুটোতে হয়েছে।

২নং তালিকার দিকে ভালো করে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যাবে ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকাগুলি সম্পর্কে যে কথা সত্য ভারতের অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকাগুলি সম্পর্কেও তা অসত্য নয়, যদিও হয়ত ক্ষেত্র বিশেষে কিছু উনিশ-বিশ হতে পারে।

ভারতীয় সংবাদপত্রের মালিকানা কি পরিমাণে কেন্দ্রীভূত হয়েছে তার হিসেব করতে গিয়ে আমরা এতক্ষণ শুধু বৃহদায়তন সংবাদপত্রগুলিকেই আলোচনার মধ্যে ধরেছি। ভারতীয় সংবাদপত্রের মালিকানা, তার কেন্দ্রীভবন ও প্রচার সংখ্যা সম্পর্কে এইবার একটা সামগ্রিক ধারণা দেবার চেষ্টা করা হবে ৩নং তালিকায় :

৩ নং তালিকা

মালিকানার ধরনের ভিত্তিতে দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকাসমূহের সর্বভারতীয় প্রচার সংখ্যা

মালিকানার ধরন	ইউনিটের সংখ্যা		সংবাদপত্রের সংখ্যা		লাখের হিসাবে		প্রচার সংখ্যা শতকরা হিসাবে	
	১৯৬০	১৯৬১	১৯৬০	১৯৬১	১৯৬০	১৯৬১	১৯৬০	১৯৬১
চেন	১৭	১৪	১০৩	৯৬	২৫.০১	২৭.৮৯	১৩.৭	১৪.৮
গ্রুপ	৪২	৪৬	১১৫	১১৯	১৭.৫১	২০.৭২	৯.৬	১১.০
মাল্‌টিপল্ ইউনিট	২৩	২৪	৬০	৬২	১২.৩৫	১৩.৮২	৬.৮	৭.৪
মোট	৮২	৮৪	২৭৮	২৭৭	৫৪.৮৭	৬২.৪৩	৩০.১	৩৩.২

৩নং তালিকা থেকে দেখা যাবে ব্যাপ্তি এবং সংখ্যা উভয় দিক থেকেই সংবাদপত্রের মালিকানা উত্তরোত্তর কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। চেন, গ্রুপ ও মাল্‌টিপল্ ইউনিট নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের প্রচার সংখ্যা ১৯৬০ সালে ছিল ৩০·১ শতাংশ। ১৯৬১ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৩৩·২ শতাংশ। প্রেস রেজিষ্ট্রারের রিপোর্টে (১৯৬২) বলা হয়েছে চেন, গ্রুপ ও মাল্‌টিপল্ ইউনিট পরিচালিত ১৪৫টি দৈনিক পত্র দেশের সমস্ত দৈনিক পত্রিকার সর্বমোট প্রচার সংখ্যার ৭২·১ শতাংশ নিয়ন্ত্রন করে। আগের বছর এই সংখ্যা ছিল ৬৭·৫ শতাংশ এবং তা নিয়ন্ত্রন করত সাধারণ মালিকানাধীন ১৬৭টি দৈনিক পত্রিকা।

আমাদের দেশে সংবাদপত্রজগতে 'মনোপলির' বিকাশ হয়তো ভিন্নপথে ঘটছে। বড় সংবাদপত্র কর্তৃক ছোট সংবাদপত্র কিনে নেবার দৃষ্টান্ত হয়ত বেশি নেই। তবু মনোপলির বিকাশ যে ঘটছে তাতে সন্দেহ নেই। বড় সংবাদপত্রগুলি আরও বড়ো হচ্ছে, তাদের প্রচার সংখ্যা স্ফীততর হচ্ছে আর ছোট সংবাদপত্রগুলি প্রতিযোগিতা থেকে ক্রমশ হটে যাচ্ছে, কেউ পাততাড়ি গুটোতে বাধ্য হচ্ছে, কেউ বা টিম টিম করে কোনো রকমে টিঁকে আছে। অর্থাৎ আমরাও সেই বিপজ্জনক অবস্থায় পৌছেছি স্যার ফ্রান্সিস-এর কথার পুনরাবৃত্তি করে যখন বলতে পারি : We read more and more copies of fewer and fewer newspapers.

আমাদের দেশে সংবাদপত্র-পাঠকের সংখ্যা এখনও অবশ্য সংপৃক্তি বিন্দুতে (saturation point) পৌছয় নি। দেশে শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হয়ত সংবাদপত্রের পাঠকের সংখ্যাও বাড়বে। কিন্তু তাতেও যে অবস্থার খুব একটা হেরফের হবে তা মনে হয় না। কেননা সেই হবু পাঠকেরা,—আন্তর্জাতিক প্রেস ইন্‌ষ্টিটিউট-এর এশীয় দপ্তরের কর্তা ভিতাচি যাদের বলেছেন—'ওয়েটিং মিলিয়নস্', অপেক্ষমাণ অক্ষৌহিণী,—তারাও আকৃষ্ট হবেন চাকচিক্যময় বড় কাগজগুলির দিকেই। আর নতুন নতুন কাগজ যে বের হবে তার আশাও সুদূর পরাহত। একটা নতুন ইংরেজী দৈনিক কাগজ বের করতে খরচ লাগে কম করে ১৮ লক্ষ টাকা (দেশীয় ভাষায় হলে কিছু কম) প্রেস কমিশনের হিসাব অনুসারেই। প্রেস কমিশন এই হিসেব করেছিলেন ১৯৫৪ সালে। তারপর জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে প্রচুর কাজেই এই টাকার অঙ্কও বাড়বে বই কমবে না। সুতরাং সাত মন তেল পোড়াবে কে যে রাধা নাচবে ?

অর্থাৎ আজও যেমন, আগামী কালও তেমন ক্রমশ বেশি বেশি সংখ্যক পাঠক কম সংখ্যক কাগজ পড়বেন বা পড়তে বাধ্য হবেন।

। তিন ।

প্রবন্ধের একেবারে শুরুতেই আমরা বলেছি, যে-সব দুর্লক্ষণের প্রতি স্যার ফ্রান্সিস তার বইতে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন তার অনেকগুলিই এদেশের সংবাদপত্র জগতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং এক হিসেবে ভারতবর্ষের ফোর্থ এস্টেটের অবস্থা আরও বেশি বিপজ্জনক। এই সিদ্ধান্তের একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে।

বিলেত বা আমেরিকায় সংবাদপত্রই একটা শিল্প এবং সেই শিল্পে মালিকানার কেন্দ্রীভবন ঘটেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে মালিকানার কেন্দ্রীভবন তো ঘটছেই পরন্তু মালিকানা চলে যাচ্ছে বৃহৎ শিল্পপতিদের হাতে। বিলেতে লর্ড বিভারব্রুক অনেকগুলি খবরের কাগজের মালিক, কিন্তু তিনি অন্য কোনো শিল্পে অর্থ লগ্নী করেন নি। আমেরিকাতেও অনেক ক্রোড়পতি সংবাদপত্রের মালিক আছেন কিন্তু তাঁদের পুঁজি অন্য শিল্পে খাটে না। ওসব দেশে শিল্পপতিরা সংবাদপত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করেন বটে কিন্তু তা করেন অনেকটা পরোক্ষভাবে, বিজ্ঞাপনের মারফৎ। কিন্তু বিড়লা, ডালমিয়া-জৈন, গোয়েঙ্কারা কাগজ বের করে বা কিনে নিয়ে সরাসরি মালিক হয়ে বসছেন। টাটারা কি স্যার বীরেন এতকাল কোনো খবরের কাগজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। ইদানীং তারাও প্রভাবশালী 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার মালিকগোষ্ঠীতে যোগ দিলেন।

প্রথমোক্ত তিনজন, অর্থাৎ, বিড়লা, ডালমিয়া-জৈন ও গোয়েঙ্কারা সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যার বেশ বড় একটা অংশ এখনই নিয়ন্ত্রন করেন। প্রেস রেজিস্ট্রারের বিবরণে (১৯৬১) দেখা যায় গোয়েঙ্কার 'এক্সপ্রেস' চেনের প্রচারসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭,৫৩,৫৫৪। ইংরেজী সংবাদপত্র সমূহের সর্বমোট প্রচার সংখ্যা ১১.১৫ লক্ষ। তার মধ্যে এক্সপ্রেস চেন-এর অংশ হচ্ছে ২·০৭ লক্ষ অর্থাৎ ২০ শতাংশ। আগে এদের প্রচার সংখ্যা ছিল মাত্র ৮ শতাংশ।

ডালমিয়া-জৈন-এর 'টাইমস' গোষ্ঠীর প্রচার সংখ্যাও অনুরূপভাবে বেড়েছে। তিনটি কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত নবভারত টাইমস্-এর প্রচার সংখ্যা ছিল মাত্র

২৫,৫৫১। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,২২,১২৭। ১৯৫৪ সালেও বেনেট কোলম্যান কোম্পানী নিম্নলিখিত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করত : টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া বোম্বাই ও দিল্লী থেকে, নবভারত টাইমস্ বোম্বাই, দিল্লী ও কলকাতা থেকে, ইলাস্‌ট্রেটেড উইক্‌লি, ধর্মযুগ, ও ইভনিং নিউজ অব ইণ্ডিয়া। বর্তমানে এঁদের সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ফিল্ম ফেয়ার ; ফেমিনা, পরাগ ও সরিকা নামে সাময়িক পত্র ও ইকনমিক টাইমস্ নামে দৈনিক পত্র।

বিড়লাদের সংবাদপত্রসমূহের প্রচার সংখ্যাও অনুরূপভাবে বেড়েছে। ১৯৫৮ সালেও বিড়লাগোষ্ঠীর সংবাদপত্রসমূহের সর্বমোট প্রচার সংখ্যা ১,২৩,০০০-এর বেশি ছিল না। ১৯৬০ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,৩০,২৯২। হালে তা নাকি আরও বেড়েছে। হিন্দুস্থান টাইমস্-এর প্রচার সংখ্যা ৪৮,১৪১ থেকে বেড়ে ১৯৬০ সালে দাঁড়িয়েছে ৮৭,০০০। বর্তমানে তা নাকি এক লাখ ছুঁই ছুঁই করছে। হিন্দুস্থান (হিন্দী)-এর প্রচার সংখ্যা ১৯৫৪ সালে ছিল ২১,৪৬৩। গত বছরের শেষে এই পত্রিকা ৬৮,৮৪৯ প্রচার সংখ্যা দাবি করেছে।

আগেই বলা হয়েছে পাচটি মালিকগোষ্ঠী ভারতবর্ষের সংবাদপত্রসমূহের প্রচার সংখ্যার ৫০ শতাংশ নিয়ন্ত্রন করে। এখন দেখা যাচ্ছে সেই পাচটি গোষ্ঠীর মধ্যে তিনটিই হচ্ছে বৃহৎ শিল্পপতিগোষ্ঠী। অর্থাৎ, আমরা ক্রমশ বেশি বেশি সংখ্যায় কমসংখ্যক খবরের কাগজ তো পড়ছিই সেই কমসংখ্যক সংবাদপত্রের আবার অধিকাংশেরই মালিক শিল্পপতিরা।

ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে, 'বাঁশীওয়ালাকে যে পয়সা দেয় কী সুর বাজাতে হবে তাও সেই বলে দেয়।' কথাটা খবরের কাগজ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। সাংবাদিকের স্বাধীনতা একটা ফাঁকা বুলি মাত্র, সংবাদপত্রের নীতি নির্ধারণ করেন মালিক, সাংবাদিকদের তাতে কোনো ভূমিকা নেই, তাঁরা শুধুই আজ্ঞাবহ। অর্থাৎ সংবাদপত্রের নীতি নির্ধারিত হয় জনসাধারণের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রেখে নয়, মালিকের খেয়াল-খুশী মতো। আর আমাদের দেশে যেহেতু সংবাদপত্রের সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী মালিকগোষ্ঠী শিল্পপতিরা তাই সংবাদপত্রের নীতিও নির্ধারিত হয় তাদেরই স্বার্থে। কেন যে আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলি শিল্প-জাতীয়করণের বিরোধী, কেন যে সমাজতন্ত্রের উপর তাদের এতো বিরাগ, কেন যে শিল্পের জাতীয়করণ ও পরিকল্পিত অর্থনীতির

সমর্থক বলে পরিচিত মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তাদের এতো আক্রোশ এবারে তা হয়তো পরিষ্কার হবে।

পুঁজিবাদী দেশ মাত্রেই শিল্পপতিরা সংবাদপত্রের নীতি অল্প-বিস্তর প্রভাবিত করে থাকেন। আগেই বলেছি তাদের তা করতে হয় বিজ্ঞাপন মারফৎ। যেহেতু বিজ্ঞাপন কারা দিচ্ছেন জনসাধারণের তা জানা থাকে, তাই সে সম্পর্কে তাঁরা সাবধান হতে পারেন। আমাদের দেশে সেই বিজ্ঞাপনই বের হয় নিখরচায়, সম্পাদকীয় কলমে, আর তাই জনসাধারণ সে সম্পর্কে সাবধান হতে পারেন না। এই জন্যই বলছিলাম, আমাদের দেশের সংবাদপত্র জগতের অবস্থা এক হিসেবে আরও বিপজ্জনক।

॥ চার ॥

প্রবন্ধের প্রথমাংশে আমরা সূত্রাকারে বলেছিলাম, সংবাদপত্রের মালিকানা যত কেন্দ্রীভূত হচ্ছে পাঠকদের বেছে নেবার স্বাধীনতা ততো সঙ্কুচিত হচ্ছে। আর মালিকদের শক্তিবৃদ্ধির অনুপাতে ক্ষুন্ন হচ্ছে সাংবাদিক ও সম্পাদকের স্বাধীনতা।

বাস্তব অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে এইবার এই সিদ্ধান্তটি যাচাই করে দেখব।

প্রথমে সাংবাদিকের স্বাধীনতার কথাই ধরা যাক। নোবল্ প্রফেশন, সম্মানিত পেশা ইত্যাদি নানা গালভরা বিশেষণে সাংবাদিক বৃত্তির সবিশেষ পরিচয় দেওয়া হয়। আসলে কিন্তু সাংবাদিকেরাও বেতন-দাস ছাড়া আর কিছু নয়। বরঞ্চ, অন্তত ভারতবর্ষে, তাঁদের শৃঙ্খল আরও গুরুভার। অধ্যাপক, শিক্ষক, করণিক প্রভৃতি এক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বনিবনা না হলে অন্য প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন, অন্তত তত্ত্বগতভাবে তাতে বাধা নেই। তত্ত্বগত বাধা অবশ্য সাংবাদিকেরও নেই। কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা কি? কলকাতার কথাই ধরা যাক। জীবনধারণের উপযোগী বেতন দিতে পারে এরূপ সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান কলকাতায় মাত্র তিনটি আছে। সাংবাদিকের বেছে নেবার স্বাধীনতা তার ফলে এমনিতেই সীমাবদ্ধ। তদুপরি তিনটি প্রতিষ্ঠানের মালিকদের মধ্যে বোঝপড়া এতটা প্রবল যে কোনো সাংবাদিক যদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তরের জন্য এক প্রতিষ্ঠান থেকে চাকরী ছেড়ে দেন অপর দুটি প্রতিষ্ঠানে তার চাকরী পাওয়া একরূপ অসম্ভব। গত দশকে অমৃতবাজার পত্রিকার কর্মচারীরা একবার ধর্মঘট করেছিলেন। ফলে অনেকের চাকরী

গিয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন কৃতবিদ্য সাংবাদিক। তাঁদের অধিকাংশই অদ্যাবধি সাংবাদিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি। সম্প্রতি অবশ্য একটি আইন পাশ হয়েছে, সাংবাদিক যদি বিবেকগত কারণে চাকরী ছেড়ে দেন তবে তাঁর প্রাপ্য পাওনা—(গ্রাচুয়িটি, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ইত্যাদি) সবই পাবেন। এতে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে বিবেকগত কারণে তাঁরা চাকরী যে ছাড়বেন তারপর তারা যাবেন কোথায়? খাবেন কি? ফলে সাংবাদিকরা গড্ডলিকপ্রবাহে গা ভাসিয়েছেন, বিবেক তাঁদের কাছে বিলাসমাত্র। পেশাগত নীতিবোধ নিয়ে তারা আর মাথা ঘামান না, জেনে-শুনে মিথ্যে রিপোর্ট লেখেন মালিকের নির্দেশে, অম্লান বদনে সংবাদ চেপে দেন, বিকৃত করেন, বিভ্রান্তিকর শিরোনামা দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেন। মালিক যদি বলেন, সূর্য পশ্চিম দিক দিয়ে ওঠে তাঁরা তাতেই সায় দেন। না দিয়ে উপায় কি!

সম্পাদকদেরও সেই একই অবস্থা। বিবেক নামক বস্তুটি আপিসের চৌকাঠ পেরোবার সময় তাঁদের বাইরে রেখে আসতে হয়। তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি, স্বাধীন বিচারবোধ ইত্যাদির এখন আর কোনো দাম নেই। মালিকের নির্দেশে তাকে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতে হয়। একজন জাঁদরেল সংবাদপত্রমালিক প্রেস কমিশনের কাছে সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে সোজাসুজি বলেই দিয়েছিলেন, 'কোনো সম্পাদক যদি তাঁর স্বাধীনতা বা মর্যাদাবোধ সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন হন তবে পদত্যাগ পত্র পকেটে করে ঘোরাই তাঁর উচিত। কথাটা তেঁতো শোনাতে পারে, তবু মালিকপ্রভুকে ধন্যবাদ, তিনি সত্য কথাই বলেছেন।

এক সময় মাত্র কয়েক হাজার টাকা হলেই একটি দৈনিক পত্রিকা বের করা যেত। শোনা যায়, আনন্দবাজার পত্রিকা নাকি শুরু হয়েছিল মাত্র হাজার ছয়েক টাকা নিয়ে। তখন ছিল সম্পাদকদের (এবং সাংবাদিকদেরও) স্বাধীনতার স্বর্ণযুগ। স্বাধীন চেতা সম্পাদকেরাই তখন পত্রিকা বের করতেন, তাদের প্রত্যেকেরই থাকত একটা মিশন। সংবাদপত্র তখনও ব্যবসা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সাংবাদিকেরা নিয়মিত মাইনে পেতেন না, সম্পাদকদের জন্য জেলের দরজা খোলাই থাকত।

ভারতীয় সংবাদপত্রের ব্যবসা হিসাবে প্রতিষ্ঠা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমল থেকে। সংবাদপত্রের আয় ফেঁপে ফুলে উঠল প্রায় রাতারাতি, কাগজগুলো বড় হতে থাকল, প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা বাড়ল আর তার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত

হলো সম্পাদক তথা সাংবাদিকের স্বাধীনতা। ইতিমধ্যে পত্রিকা প্রকাশের ব্যায় বেড়ে গেল অস্বাভাবিকভাবে। স্বাধীন চেতা সম্পাদকের পক্ষে নতুন কাগজ বের করা অসম্ভব হয়ে উঠলো। গত পঁচিশ বছরের মধ্যে বাংলা দেশে কোনো নতুন দৈনিক পত্রিকা বের হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নি। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের মতো জাঁদরেল সম্পাদককে এই সময়ই আনন্দবাজার থেকে বিদায় নিতে হলো। সেই শুরু। আর সেই স্থচনারই সাম্প্রতিক পরিণতি যুগান্তর থেকে বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের বিদায়। বাংলাদেশের বৃহৎ সংবাদপত্রগুলিতে বেতনভুক সম্পাদক এখন মাত্র দুজন অবশিষ্ট আছেন।

এই বেতনভুক সাংবাদিকদের অবস্থা কি। একজন প্রবীণ সম্পাদক শ্রীচলাপতি রাও একটি তিক্ত প্রবন্ধে তার কিছু আভাস দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, “The editor is like a petition writer, more often a 'munshi' who presides over a set of petition writers. Editorials are now derisively called proprietorials.” অর্ধশিক্ষিত প্রভুর অমৃত-বাণীর বাণীরূপ দেওয়াই এখন সম্পাদকের কাজ। তদুপরি আমাদের সংবাদপত্র সম্রাটরা আবার শিল্প-সাম্রাজ্যেরও অধিপতি। চলাপতি রাও-এর ভাষায়, “…to them the newspaper industry is an accessory of Big Business and a means of extraneous influence and power; their factory managers are managing directors of newspapers and many think that newspapers are products no different to gunny bags. The industry in India is becoming a subsidiary of the jute industry, the cement industry and the textile industry.” খবরের কাগজ আর জনমতের দর্পণ নেই, হয়ে উঠেছে শিল্পপতিদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার।

কিন্তু বেতনভুক সম্পাদক নামধেয় এই একান্ত বশংবদ জীবটিকেও এখন আর পুরো বিশ্বাস করতে পারছেন না মালিকেরা। কথায়ই আছে, Even a worm turns. অতএব কী দরকার ঝুঁকি নিয়ে! মালিকেরা, যাঁদের অনেকেরই বিদ্বেবুদ্ধিই, শ্রীনেহরুর ভাষায়, শূন্যের কিছু উপরে, তারা সরাসরি এসে বসে পড়ছেন সম্পাদকের চেয়ারে।

এই সব সংবাদপত্র-মোগলদের না আছে লঘুগুরু জ্ঞান, না আছে দায়িত্ববোধ পেশাগত শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা তো নেই-ই। কিন্তু আছে এক ধরনের উদ্ধত

মতান্ধতা। ফলে সংবাদপত্রের পেশাগত মান নেমে যাচ্ছে। এমন কি পুঁজিবাদী দেশেও সংবাদপত্রের যে আচরণবিধি গড়ে উঠেছে তা এদেশে অনুসৃত হয় লঙ্ঘনের মধ্য দিয়েই বেশি। এদেশের সংবাদপত্রে সরাসরি উচ্ছৃঙ্খলতা এমন কি হিংসাত্মক কার্যে উৎসাহ দেওয়া হয়, সংবাদ বিকৃত করা হয়, মিথ্যা 'সংবাদ' ফলাও করে পরিবেশন করা হয়। এদেশের সংবাদপত্র প্রধান মন্ত্রী, বিদেশী অতিথি, এমন কি আচার্য বিনোবা ভাবের মতো সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে ইতর ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে পশ্চাদপদ হয় না —অন্য পরে কাঃ কথা! বঙ্কিমচন্দ্রের সেই খেদোক্তি অন্তত বাংলাদেশের সংবাদপত্রজগত সম্পর্কে আজ আবার সত্য হয়ে উঠেছে: 'সম্পাদক অবতারের বধ্য ভদ্রলোক!'

॥ পাঁচ ॥

গণতন্ত্রের সাফল্যের একটা প্রধান শর্ত স্থশিক্ষিত জনসাধারণ, যাঁরা চারপাশে কি ঘটছে না ঘটছে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকবে, নানা মত শুনবে, বিচার করবে এবং তার ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে নিজের মনস্থির করবে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জনসাধারণের যে মত গঠিত হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় তাকেই বলা হয় জনমত। এইরূপ স্থশিক্ষিত জনমতই গণতন্ত্রের ধারক, বাহক এবং চালক বলে স্বীকৃত। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোয় স্বাধীন ও দায়িত্বশীল সংবাদপত্রের ভূমিকার উপর এতো যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে তার কারণ চারপাশে কি ঘটছে না ঘটছে সংবাদপত্র তার বিষয়মুখ নিরপেক্ষ বিবরণ পরিবেশন করে, এবং দায়িত্বশীল সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও মন্তব্যের সাহায্যে জনমত গঠন করতে সাহায্য করে। ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায় একই ঘটনাকে ভিন্ন ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। জনসাধারণ এইসব ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকা পাঠ করেন, একই ঘটনার সম্ভাব্য নানা ব্যাখ্যা খুঁটিয়ে বিচার করে স্বাধীনভাবে নিজেদের মত গঠন করেন। গণতন্ত্রে এই হলো সংবাদপত্রের আদর্শ ভূমিকা। এই আদর্শ সাধারণভাবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে কতটা অনুসৃত হয় বা আদৌ অনুসৃত হয় কি না তা নিয়ে অবশ্য সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রাদর্শ চরম কি না বা তা শ্রেণী স্বার্থের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত কি না তা নিয়েও মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষে বর্তমান অবস্থায় গণতন্ত্র যদি কাম্য হয়, অন্তত যাঁরা তা কাম্য

মনে করেন, তাঁরা নিশ্চয়ই চাইবেন সাংবাদপত্র এই আদর্শ ভূমিকা পালন করুক। কেন না সংবাদপত্র যদি এই ভূমিকা থেকে বিচ্যুত হয় তাহলে গণতন্ত্রের ভিত্তি সংকুচিত হবে, রাষ্ট্রদেহে নানা রোগ দেখা দেবে এবং শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটবে।

আমরা ইতিপূর্বে পরিসংখ্যানের যে সব সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করেছি তা থেকেই দেখা যাবে, সংবাদপত্রের এই আদর্শ ভূমিকা পালনের পক্ষে যে শর্তটি একেবারে প্রাথমিক—পাঠকের বেছে নেবার স্বাধীনতা—তা এখনই দুর্লভ এবং ক্রমশ তা আরও সংকুচিত হচ্ছে। পাঠক কোন কাগজ পড়বেন, আর কোন কাগজ পড়বেন না তার উপর কোনো রাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধ আছে তা নয়, আসলে বেছে নেবার মতো নানা মতের কাগজেরই অভাব। সংবাদ সরবরাহের উৎসের উপরই ধনকুবেরদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

সংবাদ সরবরাহের উৎসের উপর এই একচেটিয়া কর্তৃত্বের ফল হয়েছে এই যে মুষ্টিমেয় বেসরকারী ব্যক্তি তাঁদের খেয়াল-খুশী মতো স্থির করছেন কোন সংবাদ জনসাধারণ পাবেন এবং কি ভাবে তা পরিবেশন করা হবে। যেহেতু এই মুষ্টিমেয় ব্যক্তিরা কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ তাই সংবাদকে এমনভাবে পরিবেশন করা হয় যাতে তা কোনোক্রমেই কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে না যায়, বরং তার সহায়তা করে। শুধু তাই নয়, যে সংবাদ কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে পারে তা চেপে যাওয়া হয়। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে ডালমিয়া-জৈন প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি বিষয়ে ভিভিয়ান বসু কমিশনের চাঞ্চল্যকর রিপোর্টটি দুচারটি ক্ষীণকণ্ঠ সংবাদপত্র ছাড়া আর প্রায় সকলেই বেমালুম চেপে গেছেন। এমন কি প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতাও মনঃপূত না হলে তাঁরা চেপে যান। নর্থ বোম্বাইয়ে লোকসভার নির্বাচন উপলক্ষে শ্রীনেহরু যে বক্তৃতা দেন বোম্বাইয়ের কোনো কাগজে তার এক বর্ণও প্রকাশিত হয় নি। ভারতীয় প্রেস ইনস্টিটিউটের সভায় ভারতীয় সংবাদপত্রের গলদগুলি উদ্‌ঘাটিত করে শ্রীনেহরু যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা প্রায় সব কাগজেই এমনভাবে ছাপা হয়েছিল যাতে পাঠকের চোখে তা না পড়ে। দৃষ্টান্তের শেষ নেই কিন্তু এখানে তার উল্লেখের স্থানাভাব। মোটের উপর কথা হলো এই যে তথ্য, যার উপর দাঁড়িয়ে জনসাধারণ মনস্থির করবেন তার অবারিত অধিকার থেকে তাঁরা বঞ্চিত হচ্ছেন, সংবাদ সরবরাহের উৎসের উপর কায়েমী স্বার্থের একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে।

বিলেতের 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকার এক প্রাক্তন জাঁদরেল সম্পাদক স্যার সি. পি. স্কট বলেছিলেন, 'Facts are sacred, comment is free.' তথ্য পবিত্র, মন্তব্য স্বাধীন। স্কট কথিত সংবাদপত্রের এই আচরণ-বিধি বিলেতে কতটা আচরিত হয় জানি না, ভারতবর্ষে যে হয় না তা স্পষ্ট। ভারতবর্ষের সংবাদপত্রে সংবাদ শুধু চেপে যাওয়া হয় না, বিকৃতও করা হয়, এমন কি সম্পূর্ণ মিথ্যা 'সংবাদ'-ও পরিবেশন করা হয়। পাঠকদের হয়ত মনে আছে চীনা আক্রমণের উদ্বেগময় দিনগুলিতে চীনা কন্সাল জেনারেলের সঙ্গে কিছু ভারতীয়ের খানা-পিনা এবং টাকা লেনদেনের এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ কলকাতার কয়েকটি প্রধান সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপা হয়েছিল। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এ-সংবাদের প্রতিবাদ করেছেন সর্বৈব মিথ্যা বলে। কিন্তু হাতে-নাতে ধরা পড়েও খবরের কাগজওয়ালারা লজ্জা পান নি, বরং বড় গলা করে মুখ্যমন্ত্রীকেই দোষী করতে চেয়েছেন। এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, কলকাতায় দাঙ্গার সময় কি ভাবে বাজার গুজব কুড়িয়ে এনে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ফলাও করে ছাপান হতো, কলকাতার সাংবাদিকেরা অন্তত তা জানেন। অবস্থাদৃষ্টে চলাপতি রাও মন্তব্য করেছেন, "Walter Lippman is content to analyse whatever news is available, the Indian Lippman must invent news to analyse it."

সংবাদপত্রের মালিকানা মুষ্টিমেয় হাতে কেন্দ্রীভূত হবার ফলে জনসাধারণ শুধু যে তথ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, শুধু যে বিকৃত তথ্য বা মিথ্যা সংবাদে বিভ্রান্ত হচ্ছেন তাই নয়, মুষ্টিমেয়র মতামতকে জনমত বলে দাবি করে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে তাদের মূলনীতিগুলি পরিবর্তনের জন্য।

আমাদের সরকার সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্র গঠন, পরিকল্পিত অর্থনীতি প্রবর্তন ও শিল্পের জাতীয়করণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই তারা নির্বাচকমণ্ডলীর ছাড়পত্র পেয়েছে। শিল্পপতিদের পত্রিকাগুলির জেহাদ ঠিক এইসব নীতিগুলির বিরুদ্ধেই। অথচ সরকারের এ-বিষয়ে কোনো মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। ১৯৫৪ সালে প্রেস কমিশন সংবাদপত্রে একচেটিয়া মালিকানার বিকাশ সম্পর্কে যে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তা উপেক্ষিত হয়েছে, যে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করেছিলেন তা অদ্যাবধি কাগজে কলমেই রয়েছে। ভারতীয় প্রেস ইনস্টিটিউটের সভায় শ্রীনেহরু অনেক ভালো ভালো কথা বলেছিলেন কিন্তু তারপরও কোনো কাজ হয় নি।

যখন প্রয়োজন ছিল একদিকে সংবাদপত্রে মনোপলির বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা অন্যদিকে ছোট ছোট কাগজগুলিকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করা তখন বিজ্ঞাপন ইত্যাদি বণ্টনের ব্যাপারেও সরকার বৃহৎ শিল্পপতিদের মনোভাবই অবলম্বন করেছেন। ছোট সংবাদপত্রগুলি সমাজতন্ত্রের সমর্থক কিনা, মনোপলি বিরোধী কিনা, পরিকল্পিত অর্থনীতির সমর্থক কিনা এসব তাঁরা বিচার করেন না তাঁরা দেখেন প্রচার সংখ্যা ইত্যাদি। ছোট কাগজগুলির প্রচার সংখ্যা তো কম হবেই, তাদের সঙ্গতি কম, বৃহৎ পুঁজির সমর্থন নেই তাদের পিছনে বরং বিরোধিতা আছে—সেই কারণেই তো তাদের সাহায্য করা দরকার। কিন্তু শুধু বিজ্ঞাপন নয়, সংবাদ ইত্যাদি পরিবেশনের ব্যাপারেও সরকারের পক্ষপাতিত্ব ছোট কাগজগুলির বিরুদ্ধেই যায়। পৃষ্ঠা অনুসারে দাম নির্ধারণের জন্য সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন তাতে ছোট কাগজের সুবিধা হতো। সুপ্রিম কোর্ট সে ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়েছে। সরকার তারপর আর এ-সম্পর্কে কিছু করেন নি।

বিলেতের 'অবজারভার' পত্রিকা লিখেছিল, "The positive line is for the Government to try and create conditions under which small and "middle" sized papers could continue to flourish and newspapers could be started. Here the root problem is costs: What is really wanted is a continuing body, a permanent commission something like the Transport Commission or the University Grants Committee—which would watch over the whole field of mass communications…" এই প্রস্তাব অবশ্যই বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। মোট কথা এখুনি এ-বিষয়ে কিছু করা দরকার।

সরকারের প্রতিশ্রুতিগুলি যদি ফাঁকা কথা না হয়, যদি সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের প্রতি তাঁদের আনুগত্য আন্তরিক হয় তাহলে আর তাঁরা কালহরণ করবেন না, অবিলম্বে প্রেস কাউন্সিল গঠন করবেন, সংবাদপত্রের জন্য আচরণ-বিধি নির্ধারণ করবেন। আমরোহা, ফরাক্কাবাদ, রাজকোট বিপদের লাল সংকেত। দেরী করলে বিপর্যয় ঘটবে।

কিছু করার ইচ্ছে থাকলে এখনই তা করতে হবে। মনোপলি সংবাদপত্রের ক্ষমতা এখনও সীমাবদ্ধ। ভিতাচি কথিত 'অপেক্ষমাণ অক্ষৌহিণী' যখন

কাগজ পড়তে পারবে এবং পড়বে তখন এই সব সংবাদপত্রের ক্ষমতা দুর্দমণীয় হয়ে উঠবে। তখন ইচ্ছে করলেও সরকার সহজে আর তাদের ক্ষমতা খর্ব করতে পারবেন না। আর তা যদি হয় তো সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ তো দূরস্থান এমন কি উদারনৈতিক গণতন্ত্রেরও সমাধি রচিত হবে। ভারতবর্ষের পক্ষে সে হবে চরম দুর্দিনের সূচনা।

এই প্রবন্ধ লিখতে যে সব গ্রন্থ ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

1. Dangerous Estate : Francis Williams.
2. Mainstream, No. 1, Sept : 1, 1962
3. Seminar (The Press), Feb. 1963.
4. Stop the Press : George Marion
5. American Democracy : Laski.
6. The Press Commission Report, 1954.
7. Annual Report of the Registrar of Newspapers for India, 1962.
8. A History of the Press in India : S. Natarajan

রূপনারানের কূলে

গোপাল হালদার

(পূর্বানুবৃত্তি)

[৩]

শ্রুতিলিপি ও স্মৃতিলিপি

সংক্ষেপিত হলেও এই পিতৃস্মৃতি দীর্ঘ হয়ে গেল। তার স্বপক্ষে একটু কৈফিয়ৎ আছে। আমার লেখা 'সংস্কৃতির রূপান্তর'-এর উৎসর্গটিতে তার আভাস পাওয়া যায়। বাং ১৩৪৮-এর আশ্বিন, ইং অক্টোবর, ১৯৪১-এ, সে বই-এর প্রথম প্রকাশ। বাবার মৃত্যুর প্রায় দশ বৎসর পরেকার লেখা সেই উৎসর্গটি এরূপ :

"বাঙলা দেশের যে যুগ আজ শেষ হইয়াছে
তাহার সংস্কৃতির
শুভ্র ও সানন্দ প্রকাশ যাঁহার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম,
আমার সেই
পরলোকগত পিতৃদেব সীতাকান্ত হালদার মহাশয়ের
চরণোদ্দেশে—"

ত্রিশ বৎসর পরে এখন সে মানুষের কথা এতটা উল্লেখের কারণ—এ শুধু ব্যক্তিচরিত নয়, কতকাংশে যুগাভাস। মুখ্যত ইং ১৮৭০ থেকে ইং ১৯৩০ যাঁদের জীবনকাল তাঁদের একটু পরিচয়। উদ্দেশ্যটা এই—সেই পাঁচ ফিট সাড়ে তিন ইঞ্চি ঈষৎ স্থূলকায় গৌরবর্ণ, সুস্থির গতি, কৌতুকপরায়ণ সামাজিক মানুষটিকে এর মধ্য দিয়ে যেমন জানা যাবে, তাঁর প্রতি সন্ধ্যার গল্পে আলোচনায় বৈঠকখানার বন্ধুদেরও তেমনি চেনা যাবে—স্থূলকায় বঙ্কিম বোস, শহরের সরকারী উকিল; দীর্ঘদেহ বসন্তকুমার সেনগুপ্ত, ভুলুয়ার জমিদারীর রাশভারি ম্যানেজার, দু-চারজন আরও আইনজীবী, স্কুলের পদস্থ শিক্ষক, প্রতিবেশি সরকারী চাকরে। অবশ্য এর বাইরেও থেকে যাবেন দু-একজন যাঁদের আমরা সেই বাদামতলার বৈঠকখানায় বেশি দেখতে পাই নি। ওঁর মুখেই বেশি শুনেছি তাঁদের নাম ও খ্যাতি—

জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি নাকি যৌবনে ছিলেন রবীন্দ্রমণ্ডলের যুবক। 'পলিটিকাস' নামের আড়ালে যিনি 'মডার্ন-রিভিয়ু'তে খণ্ড খণ্ড আলোচনা ছাড়া চাকরি-চক্রান্তে আর বিশেষ কিছুই রেখে যান নি। এমন আরও দু-একজনকে কদাচিৎ দেখেছি—যৌবনের প্রতিশ্রুতির প্রমাণপত্র যাঁরা রাখেন নি আর। প্রত্যেকে তাঁরা স্বতন্ত্র মানুষ—দেহে মনে সংসারের কর্মজীবনে প্রত্যেকেই ছিলেন বিশিষ্ট। সবাই মিলে তাঁরা একটা যুগ অথবা যুগাংশ। যুগটা আমার মতে ১৮১৭তে আরম্ভ হয়ে ১৯১৮তে শেষ হয়ে যাচ্ছিল—'শিক্ষিত ভদ্রলোকের যুগ'। ওঁরা তাঁর পরিণতিরই একটা প্রকাশ—'লাস্ট অব্ দি রোমান্‌স্'। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দু-দশক ও বিংশ শতাব্দীর তিন দশকে তাঁদের কর্মজীবন। এ কালটাকেই তো আমরা আবার বিশেষ অর্থে বলি 'রবীন্দ্রযুগ'—যে যুগ শেষ হয়েও শেষ হয় নি। অবশ্য ঠিক 'রবীন্দ্রভক্ত' বলতে যা বোঝায় বা বোঝাত, ওঁরা বোধহয় তাও ছিলেন না। ওঁদের ভক্তি ইংরেজি আইন-কানুনে, ন্যায়বিশ্বাসে আর লিবারল শিক্ষাদীক্ষায়। কিন্তু সে ভক্তি ভাঙন-ধরা ভক্তি। কালান্তর-এ ও সভ্যতার সংকটে এঁদের সেই স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কথা রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন। নিজেদের মতো করে বুর্জোয়া লিবারিলিজম-এর সঙ্গে হিন্দু জীবন-দর্শনের একটা মিলন তাঁরা যে করেই হোক করে নিয়েছিলেন—গোঁজামিল ; একেবারে কিন্তু 'হাকৃসলি শশধর এ্যাণ্ড goose'-এর গোঁজামিল নয়। 'গীতাই' গতি, কিন্তু মতিটা 'সায়েন্স অব্ লাইফ' আর 'শেক্সপীয়রে'ও। ভাঙন ধরলেও তাঁরা ভেঙে পড়েন নি। এই কালান্তরের কাছে সেই কালগ্রস্তদের ওই জবানবন্দী এখানে আর বাড়াব না।

পিতৃস্মৃতিতে নোয়াখালি শহরের বাদামতলার এই বৈঠকখানা আর তার পরিবেশটা এখন বড় হয়ে আছে। তাই বলে আমরা কেউ বাদামতলার বৈঠকখানায় তো জন্মি নি—মনের দ্বিজত্ব পেয়েছি। জন্মেছিলাম যে পরিবারে-পরিবেশে তার থেকে যা পেয়েছি তা নিয়েছি আরও আগে এবং আরও স্বচ্ছন্দে—জানিও নি, ভাবিও না। সেখানে কিন্তু আমাদের বড় একান্নবর্তী পরিবারের পিতামাতা ছাড়াও আরও কেউ কেউ আমাকে কম আপনার মনে করতেন না।

প্রদীপ-জ্বালার আগে সেই সলতে পাকানোর কথা হচ্ছে হালদারগোষ্ঠীর

কথা—তাও রবীন্দ্রনাথ লিখে গেছেন। তবে সে পর্ব আমার দেখা নয়। তা ছাড়া, পূর্ব-বাঙলার অভিজাতদেরও জীবনযাত্রায় অতটা আভিজাত্যের ভার সইত না। প্রতি বর্ষায় মাঠ-ঘাট জলে একাকার হয়ে যায়, বিক্রমপুরের অনেক অভিজাত উঠোনেও জল এক-আধ মাস দাঁড়িয়ে থাকে। পাকা ভিটে ও পাকা বাড়ি এই খালবিলের দেশে দুর্লভ। কীর্তিনাশার নামটা শুধু নয়, রূপও সেখানে প্রত্যক্ষ। স্মৃতিও যায় ধুয়ে মুছে যখন তার উপাদান পদ্মা নিশ্চিহ্ন করে দেয়। নওগাঁয়ের হালদারদের কি বিত্ত-বিষয় ছিল তা মনে রাখবার অবসরও ছিল না বিদ্‌গাঁওয়ের হালদারগোষ্ঠীর। নওগাঁ গিয়েছে পদ্মার গর্ভে। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে তাঁরা এই গ্রামে এসে নতুন বাড়ি গড়েছেন। খ্যাতিটা আছে 'নওগাঁয়ের হালদার' কিন্তু কার্যত বিত্তহীন, বিষয়-হীন। ভরসা শুধু বুদ্ধি, উদ্যোগ, পৌরুষ—অর্থাৎ সেদিনের অর্থকরী বিদ্যা ও কর্মশক্তির পরীক্ষা। ভূমির ভূমিকা সেখানে ফুরিয়ে আসছে—ভদ্রাসন আগলে থাকতেন তাঁদের মেয়েরা। পুরুষেরা দু-চারজন বাইরে বেরুতেন জীবিকার্জনে, পূজায়-আর্চায় ক্রিয়াকর্মে দেশে ফিরতেন আর বাকীরা সেই গৌরবে বাড়ি পাহারা দিতেন, গ্রাম জমিয়ে থাকতেন, দু-দশ বিঘা জমির জোরে জোর করে করতেন ভূঁইঞাগিরি; তার অভাবেও গ্রাম্য সমাজে ছোট, মেঝো, সেজো, কর্তা। ভূমি না থাকলেও ভৌমিকত্বের জের সমাজচেতনায় মিলিয়ে যায় নি। বিদ্‌গাঁওয়ের হালদারদের তো ভদ্রাসন ছাড়া জমি ছিল না এক কড়াও। অন্নার্জন করতে হত বিদেশে, ঢাকায়, উত্তরবঙ্গে, ত্রিপুরারাজ্যে, শেষে নতুন জেলা বিভক্ত হলে নতুন শহর নোয়াখালিতে। বিদেশেই ক্রমে একটা 'বাসা' করেছিলেন—পরিবার নিয়ে থাকতেন, সে বোধহয় শতাব্দীর তৃতীয় পাদের কথা। তাঁরাও অপেক্ষা করতেন পুজোর জন্য, তখন বাড়ি ফিরতেন। নাড়ীর টান সেখানে। আমার পর্যায়ের পূর্বজরা ও কনিষ্ঠরা কেউ-কেউ তাই ভূমিষ্ঠ হয়েছেন নোয়াখালিতে, মাত্র দু-একজন আমার মতো বিদ্‌গাঁওয়ের বাড়িতে।

এই হালদারগোষ্ঠীর উদ্যোগপর্ব বিংশ শতকের পূর্বেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। শ্রুতিলিপিতে তার যেসব কথা মনের খাতায় ধরা আছে, তার মধ্যে বনোয়ারীলালদের কথা নিরর্থক নয়।

ভৌমিকত্বের খোলস ছাড়া সাহসের কাজ। যিনি তাতে এগিয়ে যান তাঁর দুঃসাহস স্মরণে রাখবার মতো।

ঢাকা শহর তখন টলমল ব্রাহ্মধর্মের বিপুল আন্দোলনে। নর্ম্যাল-পাশকরা বরদাকান্ত হালদারও তাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন—অর্থাৎ খ্রীষ্টান হয়ে গেছেন। বাড়িতেও তাঁর ঠাঁই নেই। এদিকে বাড়িতে কর্তারা উদ্যোগ করছিলেন গলগ্রহ কুলীন ভাগ্নীকে যে-কোনো একটা কুলীনের গলায় বেঁধে নিজেদের কুলমর্যাদা বজায় রাখতে। কিন্তু তার পূর্বেই কর্তাদের মুখে কালি দিয়ে সে ভাগ্নী পালালেন সেই বনোয়ারীলালের গোপন পরামর্শে ও সার্থক উদ্যোগে। তার উদ্ধারের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হল; শেষে তার বিয়ে হল সেদিনের কৃতবিদ্য আর দুঃসাহসী আর এক ব্রাহ্ম যুবকের সঙ্গে—পরবর্তীকালে তিনিই ডেপুটি একাউন্টেন্ট জেনারেল রজনী রায়। বাড়ির কর্তা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিন্তু এই কুলধর্মত্যাগী ভাই-এর অপমানের প্রতিশোধ নিতে অবহেলা করেন নি, বিলম্বও না। হুকুম হল 'কুলাঙ্গারের রক্ত চাই', তা পেলেন। বুড়ীগঙ্গার ঘাটে বরদাকান্ত স্নান করতে যান। আততায়ীদের হাতে একদিন লাঠিপেটা হয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়েন। না মরে যে মৃতকল্প হয়েছিলেন সে ত্রুটি দুর্ধর্ষ শ্রীনাথ হালদার মহাশয়ের নয়, তাঁর লাঠিয়ালদের নয়। দায়ী বরদাকান্তের প্রাণশক্তি। বাঙলার ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের পাতায় এমন পুরুষদের অভাব ছিল না—এমন মেয়েরও না। বরদাকান্ত পৌরুষে উদ্যমে শেষ অবধি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বিজনী রাজের ম্যানেজার-রূপে আসামে। সেই মর্যাদায় শেষে কলকাতায় এসে সমাসীন হন। এখন যেখানে চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, যা ছিল দেশবন্ধুর গৃহ, তাই ছিল সেদিনে 'বিজনী হাউস'—যেখানে ম্যানেজার বরদাকান্ত হালদার শেষ-জীবনে থাকতেন। আর এখানেই স্বগৃহে তিনি স্থান দিতেন তাঁর পূর্বকার বাড়ির দরিদ্র আত্মীয়-কুটুম্বদের। সেই দাদাও পেতেন বার্ধক্যে দুরবস্থায় সেই কুলকলঙ্কের থেকে অকুণ্ঠিত সাহায্য ও সম্মান। মাথায় হাত বুলিয়ে বরদাকান্ত পূর্বেকার প্রকাণ্ড ক্ষতচিহ্নটা দেখিয়ে কুল-কনিষ্ঠদের হেসে বলতেন, 'কী দিনই যে তখন ছিল।' প্রসন্নচিত্ত, সরল, উদার সেই বরদাকান্তকে আমি দেখি নি। বাবার মুখে শুনেছি তাঁর গল্প। ছাত্রজীবনে তাঁর বাড়িতে বাবার গতায়াত ছিল। তিনি ছিলেন জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত এই জ্ঞাতিভ্রাতার স্নেহভাজন। আমি দেখেছি বরদাকান্তের পুত্র-কন্যাদের। সুরেন্দ্রনাথ হালদার, বাসন্তী দেবী, মাধুরী দেবীদের ও তাঁদের পুত্র-কন্যাদের। তার থেকেও কিছুটা বুঝেছি সেই অদেখা মানুষটিকে। শ্রুতিলিপির লেখাটা তাই

বনোয়ারীলালের রেখাচিত্রের মধ্যে মিলিয়ে যায় না। নিশ্চয়ই তেমনি বিশিষ্ট, ব্যক্তিত্ববান্, একান্নবর্তী পরিবারের চিরদিনের মান-জ্ঞানের সঙ্গে যে থাপ খাইয়ে নিজেকে ছাঁটাই করতে অস্বীকৃত। কিন্তু যে দুঃসাহসী হয়েও ক্ষমাশীল, উদ্যোগী হয়েও উদার, দশজন আত্মীয়-কুটুম্ব নিয়ে, বাঙালী ভদ্রলোকের মতো জীবনযাপনেই যাঁর আনন্দ। হয়তো এই ছিল তখনকার পৌরুষের আদর্শ।

পরেকার পর্বে আরেকজন দেখা দিলেন এ-পর্যায়ে। তাঁকে আমি দেখেছি—জীবনের প্রথম দশ বৎসর। কিন্তু তাঁর পূর্বকথা শুনেছি। এ-গোষ্ঠীতে তিনিই সম্ভবত ইংরেজী স্কুলে প্রথম পড়েছিলেন। বাল্যে পিতৃহীন হলেও বিদেশের স্কুলে কষ্ট করে পড়েন, সেদিনের 'ইম্‌তাহান' উত্তীর্ণ হন, জলপানিও পান। আরও বিদ্যালাভের আশায় চললেন কলকাতায়। পানের নৌকা যেত গোয়ালন্দ। পানের ব্যাপারীরা তাদের নৌকায় বিনি পয়সায় ব্রাহ্মণের ছেলেকে পৌছে দিলেন। সেদিনের মেডিকেল কলেজে তিনি আরম্ভ করলেন পড়াশুনা। বোধহয় সেদিনের মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের মড়াকাটার সঙ্গে 'ইয়ং বেঙ্গলী' দেমাক ও মেজাজও ছিল। চার বৎসরের শেষ পরীক্ষার পূর্বেই তিনি নেপালী এক বন্ধুর সঙ্গে চলে যান কাঠমণ্ডুতে। বন্ধু ছিলেন রাণাগোষ্ঠীর, সম্ভ্রান্ত ঐশ্বর্যবান যুবক। গ্রামের বাড়িতে মা-ভাই, কর্তারা মুখে বড়াই করতেন—'রাজপুত্রের ঐশ্বর্য নিয়ে তিনি দেশে ফিরবেন।' আর রাত্রে গোপনে বসে চোখের জল ফেলতেন—বাঁধন-ছেঁড়া এই ছেলে আর ঘরে ফিরবে কিনা কে জানে! বৎসর তিন-চার পরে তবু সে ঘরে ফিরল—একখানা কুকরী আর খান দুই নেপালী কুর্তা ইজের নিয়ে। কাঠমণ্ডুতে রাণা বা মন্ত্রী কাদের রোষে না বিদ্রোহে, তাঁর বন্ধুরা হয়েছেন নিশ্চিহ্ন। নিজে ফিরে এসেছেন, প্রাণের সঙ্গে ঐ দু-তিনটি মাত্র সম্বল। তারপর বারাণসীতে ডাক্তার রূপে তিনি ব্যবসা আরম্ভ করলেন। ইংরেজিওয়ালা বাঙালী ডাক্তার, যথেষ্ট তাঁর পশার প্রতিষ্ঠা। মা-ভাই সকলের প্রতি কর্তব্যবোধের সঙ্গে চলত তাঁর অমিতব্যয়িতা। আবার দেশে ফিরলেন, বিয়ে হল। আর বারাণসী ফেরা হল না। পুরনো বিদ্যাস্থলে গেলেন—সেখানে এখন নতুন সদর স্থাপিত হয়েছে। স্বগ্রামের ও সে অঞ্চলের লোকেরা কাছারিতে কাজকর্মে সেখানে ইতিপূর্বেই প্রাধান্য অর্জন করেছিলেন। সমস্ত শহরটা যেন এই ঢাকা-ফরিদপুরের ভদ্রলোকদের 'কলোনি'—বিশেষ করে

'বিক্রমপুরী'দের জীবিকাক্ষেত্রে—শোষণক্ষেত্র। নোয়াখালি জেলার এই নতুন সদর স্থাপিত হতেই তাঁরা বৃহত্তর সুযোগ লাভ করছেন সরকারী-বেসরকারী কাজে কর্মে, ব্যবসায়ে উদ্যোগের। ছোট হলেও উদ্যোগীর ক্ষেত্র নতুন সদর নোয়াখালি। ডাক্তার অন্নদাকান্ত হালদার, নোয়াখালিতে ইংরেজিজানা প্রথম ডাক্তার, 'হালদার এণ্ড কোং'-এর বিখ্যাত ডাক্তারখানা ও দোকান তিনিই গঠন করেন, হালদারগোষ্ঠীর এই শাখারও তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। আমার বাবার তিনিই জ্যেষ্ঠ সহোদর, দ্বিতীয় সহোদর প্রমদাকান্ত। এ শহরেই মা, স্ত্রী ও ভাইদের নিয়ে অন্নদাকান্ত বাসাবাড়ি স্থাপন করেন—নিজেই বহু আত্মীয়-কুটুম্বদের আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়ান। বাবা বারাণসীতে হিন্দী ইংরেজি স্কুলে পড়তে আরম্ভ করে বাঙলা ও ইংরেজি পড়া চালান এ-শহর থেকে। আর এখান থেকেই এণ্ট্রান্স পাশ করেন। আবার বি-এ পাশ করে এখানে এসে মাস্টারি-ওকালতিতে বসেন। এখানেই আমার দ্বিতীয় জেঠামশায়ও সরকারি আপিসে কাজ নিয়ে বসে যান। বাবার থেকে তিনি বৎসর পাঁচের বড়, বড় জেঠামশায়ের থেকে বাবা প্রায় দশ বৎসরের ছোট। ভাইদেরই শুধু তিনি মানুষ করেন নি, এ-কালের হালদারগোষ্ঠীর মূল ও কাণ্ড ডাক্তার অন্নদাকান্ত হালদার; গরীব-দুঃখী থেকে সাধু ফকির বহু লোকের সদাব্রত বন্ধু, শহরের প্রধান একজন পুরুষ। ইং ১৯১২ সনের জানুয়ারিতে তিনি অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে মারা গেলেন। তখন তাঁর বয়স ৫৪ বৎসর ছিল শুনেছিলাম। আমার তখন দশ বৎসর বয়স হতে চলেছে।

আমার স্মৃতিতে তাঁর চিত্র স্পষ্ট, শ্রুতি ও স্মৃতি পরেকার অভিজ্ঞতায় যাচাই হয়ে এ-চিত্রকে সমাদৃত ও সমুজ্জ্বল করে তুলেছে—বিরলকেশ ও দীর্ঘশ্মশ্রু এই পুরুষ যেন সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের বাঙালী সংস্করণ—বিশালকায়, সৌম্যদর্শন, উদাত্ত কণ্ঠ, মুক্ত মন, উদার প্রাণ। তাঁর ঢোলা জামা-কাপড়, রুপোর বাঁধানো লাঠি হাতে, মাথায় শীতের দিনে প্রকাণ্ড পাগড়ী—এ ধরনটা তাঁর ভাইরাও অনুসরণ করেছিলেন হয়তো বারাণসীর স্মৃতি। কিন্তু জেঠামশায়ের সবই ছিল ম্যাগনাম সাইজের। পোশাক-পরিচ্ছদ লাঠি পাগড়ি রুপোর হুক্কা প্রকাণ্ড গুড়গুড়ি তো আছেই—মাছ ধরবার শখ ছিল, তাঁর ছিপ আর তাঁর ছিপের হুইল আমাদের চোখে বিস্ময়—তাতে তিমি মাছও ধরা চলত। 'চারা' তৈরি হত বিলিতী কন্‌ডেন্‌স্‌ড মিল্কের সঙ্গে বিলিতী বিস্কুট মেখে, জলের মাছ ছেড়ে ডাঙার মানুষও তাতে আকৃষ্ট হত। বাজারে তার ডাক্তারখানাটা

করতেন দুজন সুকণ্ঠ গায়ক। কেদারেশ্বর দাশগুপ্ত ছিলেন মধুর গম্ভীর কণ্ঠের অধিকারী, শহরের শ্রেষ্ঠ অভিনয়-শিল্পীও। আর উকীল আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠ সুনম্র মধুর। পরে চরকা ও ধর্মে তার সঙ্গীত-চর্চা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। সঙ্গীত-বিত্তায় এ অধম বঞ্চিত, কিন্তু তাঁদের মধুর কণ্ঠ বাল্য-হৃদয়কে কম আনন্দাভিষিক্ত করে নি। তবে আসল কথা—ঐ শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব। আবাল্য আমি রামকৃষ্ণদেবের নাম ও সাধনার প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থাতেই অভ্যস্ত। সে মনোভাব আরও গভীরতর হয় কৈশোরে। নোয়াখালি শহরের পূর্বপ্রান্তে তখন হত রামকৃষ্ণ উৎসব, সাতদিনের মতো উৎসব—যাত্রাগান, কথকতা, বক্তৃতা। আর সর্বশেষে হত একটি 'মোচ্ছব'। এটি সর্বজনীন—তখন জেঠামশায় নেই। আর অন্যদিকে আমি পরিচিত হই সেই কৈশোরে উদ্বোধন-প্রকাশিত বিবেকানন্দের বাঙলা লেখার সঙ্গে, এবং বাবার বইএর আলমিরায় এসে পৌছায়, বোধহয় রঙ্গীনদা'র আগ্রহ্যাতিশয্যে, নটেশন্-প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের ইংরেজী বক্তৃতাবলী। স্বাদেশিকতার সূত্রে বিবেকানন্দ হয়ে উঠলেন আমাদের গুরু। কিন্তু গুরুর গুরু তার আগেই সুপরিচিত ও আরাধ্য। শ্রেষ্ঠত্বের প্রান্তে এসে যখন সমস্ত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন একটা রাষ্ট্রীয় ও বিষয়িপুষ্ট আয়োজনে মেদবহুল হয়ে উঠতে দেখলাম, তখন নিজেকে প্রশ্ন করলাম—এই কি সেদিনের পরিণতি? না, এটা কালেরই পরিহাস? চিরদিনই 'চার্চিয়ানিটি' শেষ করে সকল যুগের 'ক্রীশ্চিয়ানিটিকে'।

স্বদেশীর সময়েই তিনি বাড়িতে দুর্গাপূজায় বলি তুলে দিলেন—বাড়িতে মহিষ-বলির খড়্গাটা সিঁদুর লেপাই ছিল। তখন থেকে অন্য বলির খড়্গাও তাই থেকে গিয়েছে, আমরা দেখেছি।

জেঠা মহাশয় আসলে ছিলেন চৈতন্যদেবের অনুরাগী। ডাক্তারখানারই এক পার্শ্বে এক-জোড়া তক্তপোষের উপর বসত তাঁর বয়সী বৃদ্ধদের ভাগবত আলোচনার আসর। রোগীর জন্য মাঝে মাঝে উঠে যেতে হত, না হলে ওখানেই সন্ধ্যার পরেও চলত আলোচনা—আলমারি বোঝাই হয়ে গিয়েছিল, রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত বাঙলা ও সংস্কৃত ভক্তিশাস্ত্রে, নাট্যে, কাব্যে, জীবনীতে ও লীলাকথায়। দোলপূর্ণিমায় উৎসব হত গৃহে। তিনি বলতেন, 'মহাপ্রভুর জন্মদিন'। দোলের বেদিতে থাকত মহাপ্রভুর পট। একবার বাড়ির যুবকেরা বললেন, 'তা কেন হবে? রাধাকৃষ্ণের পট থাকবে দোলের

উপরে।' জেঠামশায় বললেন "মহাপ্রভুই রাধাকৃষ্ণ।" এ কথার গভীরত্ব যাঁরা বোঝেন নি তাঁরাও জানতেন—কলিযুগে চৈতন্যই অবতার। জেঠামশায় হয়তো জানতেন 'কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ।' নরদেহী তাঁর কাছে পেয়েছে স্বরূপ—পথ থেকে ধরে এনে খাইয়েছেন, চিকিৎসা করেছেন, পথ্যের বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন, জুগিয়েছেন শীতের কম্বল।

কোথা থেকে জেঠামশায় জুটিয়ে ফেলতেন সব অদ্ভুত মানুষকে। তিনি বলতেন—'সাধু'। রাধানাথকে মনে হত জড়বুদ্ধি পথের ভিখারী। বাড়ির শিক্ষায় আমরাও তাকে বলতাম 'রাধানাথ সাধু'। খালি পা, শীতে ছাড়া খালি গা, মলিন বাস, ধূলিধূসর বড় বড় চুল, অযত্নটা সব বিষয়ে। মাঝে-মাঝে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেন ভেতরের উঠোনে। যতই যা আমরা জানতে চাই তার মুখে উত্তর নেই। মা-জেঠাইমারা আমাদের জানতেন—বড়কর্তার নির্দেশ দুষ্টোমি শাসন করতেন। থালায় করে ডাল ভাত ব্যঞ্জন তাঁকে দিতে হবে। রাধানাথ ঘরে বা বারান্দায় আসবেন না—উঠোনেই বসে খেয়ে যাবেন। ক্ষিদে পেলে ও খাদ্য কোথাও না পেলে এ বাড়িতেই শুধু আসবেন। তেমনি নীরবে দাঁড়িয়ে থাকবেন। এই রকম কত লোককেই না ডাক্তারবাবু মনে করেন 'সাধু'। তাঁর ডাক্তারখানার কর্মচারীরা একবার রাধানাথকে একটু তামাসা করেই বললেন—'পয়সা নেবে?' সত্যই পয়সা দিতে গেলেন। এবার রাধানাথের অস্ফুট উত্তর শোনা গেল—'পয়সা দিয়া কী হইব?' একটু সমঝে নিয়ে কর্মচারীরা বললেন, "কিছু কিনে খাবে।" রাধানাথ প্রথম উত্তর দিলেন না, পরে মৃদুস্বরে বললেন, "ক্ষুধা পাইলে ভাত চামু।"

পয়সা রাধানাথ ছোঁবেন না। পয়সা দিয়ে কী হবে?

এমনি বাড়িতে আসতেন আর একজন—'মামু'। মুসলমান ফকির পরনে লুঙ্গি, পায়ে লাল মোজা ও জুতো; হাতে লাঠি, কখনো কখনো পিছনে ঝুলত একটা কাপড়ের পুঁটলি। ছোটখাটো মানুষটি—ফর্সা চেহারা, রেখা কুঞ্চিত মুখ, বয়সে আনত দেহ। মামু কখনো ঘুমুতেন বাজারের মৌলবী সাহেবদের দোকানের বারান্দার তক্তপোষে, কখনো জেঠামশায়ের ডাক্তারখানায় বা বাবার বৈঠকখানায়—কখনো কোথায় ঠিক নেই। শহর থেকে হঠাৎ উধাও হতেন, আবার তেমনি হঠাৎ দেখা দিতেন। 'মামু' গৃহে এলে আমাদের ছেলেমেয়েদের সকলের আনন্দ। বড় উঠোনে মামুর জন্য

দশটা বাছাই জিনিসের দোকানও। সত্যই বাছাই জিনিস তাতে আসত—সাহেবসুবা থেকে সম্পন্ন শৌখীন লোকদেরও ও-দোকানই ছিল ভরসা। বড় দোকানটার প্রকাণ্ড দেওয়াল-ঘড়ি, প্রকাণ্ড শো-কেস, গোটা পনের-কুড়ি কাচের আলমিরায় থাকত ওষুধপত্র—আর ওসব শৌখীন জিনিস ভরা হাণ্টলি পামারের বিস্কুট ও গোয়ালিনী-মার্কা কন্‌ডেন্‌স্‌ড মিল্কের অপচয় করতে আমাদেরও তাই বাধত না। ক্রিয়াকর্মে পুজোর বাড়িতে ঝাড়লণ্ঠনের থেকে বেশি দেখা যেত বড় বড় হারিকেন লণ্ঠন—গ্যাসের আলোর তুলনায় তার ঔজ্জ্বল্য কম। কিন্তু স্থূলোদর সেই লণ্ঠনগুলি দেখে আশ্চর্য হতে হত। অথচ পূর্ব-বাঙলার ভদ্রলোকের জীবনযাত্রার প্রধান গুণ তখনো সারল্য। আহারে-বিহারে পোশাকে-পরিচ্ছদে সেই সহজ সারল্যের সঙ্গে দেখেছি এই স্বচ্ছন্দ উদারতা। এ-ধারা আরও দু-একটি প্রতিবেশী পরিবারেও প্রবল ছিল। একান্নবর্তী পরিবারে বহুলোক দু-একজন আত্মীয়, ডাক্তারখানার কর্মচারী, উকীলের মুহুরিরা তো পরিবারেরই পরিজন। তারপর অতিথি অভ্যাগত, তাঁদের কুশলেই বাড়ির কর্তাদের কার্পণ্য নেই। মা-জেঠাইমারা দিনের বাজার যখন নাম করে করে বাঁটতেন তখন দেখেছি ২৪ কিম্বা ২৬ জনের জন্য দু-বেলা ব্যবস্থা তাঁদের করতে হত। অর্থাৎ বরাবর এ বাড়িতে যাঁদের পাত পড়ত তাঁরা সংখ্যায় এরূপ—অতিথি এলে পাতের সংখ্যা আরও একটু বাড়ত। অতিথি সহজ ভাবেই আসতেন আর স্বচ্ছন্দ মনে দশজনের মতোই গ্রহণ করতেন যা আহার্য ও পেয়। চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় এ বাড়িতে একটু ব্যতিক্রম। কিন্তু হলে তা সকলেরই হবে না হলে কারও নয়। অবশ্য জামাই বা বৈবাহিকদের বেলা বিশেষ ব্যবস্থা ছিল নিয়ম—সেই সঙ্গে বিশেষ লাভ হত বাড়ির পুত্র-কন্যাদের। কিন্তু আমার স্মৃতিতে জেঠামশায় যে বিশেষ কারণে উজ্জ্বল তার বৈশিষ্ট্য আরও ছিল। কবে থেকে কী করে যে এই মেডিকেল কলেজের সাহসী পুরুষের মনে ভক্তিভাব জন্মাল সে আমার অজানা। আমার জন্মের পূর্বেই সাধু-সজ্জনের সম্বর্ধনা নিয়ম হয়ে উঠেছিল যার জন্য আমার অগ্রজাত ভ্রাতার ডাক নাম হল 'সাধু'। হয়তো ধারাটা আগেও ছিল প্রচ্ছন্ন। কিন্তু সুদর্শন, রঙ্গীন প্রভৃতি যে-গোষ্ঠীতে ছেলেদের নাম সে-গোষ্ঠীতে প্রফুল্লর ডাক নাম হল 'সাধু', আর তারপর নামের ধাপ ছেলেদের দিকে বয়ে গেল গোপাল, গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দে, আর মেয়েদের দিকে রাধা, কৃষ্ণভামিনী থেকে লক্ষ্মী সরস্বতীতে। গোড়ার উৎস জেঠামশায়—তিনি চৈতন্যদেবের ভক্তিধর্মে

ক্রমেই অনুরক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর গুরু ছিলেন এক শাদা-পোশাক সাধু—কথা যিনি কইবেন না বলে লোকে বলত 'বোবা সাধু'। একটি কথাই তাঁর মুখে শোনা যেত "জাত কি? জাত কি?" আমার মনে তাঁর স্মৃতি নেই। ছবিতেই তাঁকে দেখেছি। তার সমাধি-চিহ্নে চারদিকে বৎসরে বৎসরে মৃত্যুদিবসে অনুষ্ঠান করতেন জেঠামশায়। কীর্তন হত উৎসব হত দোকান-পাটও আসত সামান্য—সকল জাতের সকল শ্রেণীর মানুষের মিলনেই যে উৎসব এ-ধারণা আমার মনে গেঁথে যায় এ-ভাবে, আর 'মেলা'ই যে এ-দেশের সর্বজনীন উৎসব এ বোধটাও অস্পষ্ট রূপে জন্মে—সে বোধ আমার কাছেও স্পষ্ট হয় বহু পরে, রবীন্দ্রনাথের কৃপায়।

জেঠামশায়ের দ্বিতীয় একটি উৎসবের সঙ্গেও আমার পরিচয় বাল্য বয়স থেকে। রামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব। কখন তা আরম্ভ হয় জানি না। অগ্রজরা বলেন, স্বদেশীর একটু পরে—পরমহংসদেবের নামে মধ্যবিত্ত কাল্ট তৈরী হতে পূর্ব-বাঙলায় তখনো বেশ দেরি ছিল। ডাক্তারখানার শো-কেস একপাশে সরিয়ে আসর তৈরী হত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মদিনে—ফুলে পাতায় সাজানো হত বড় ঘরটি। এক পাশে হত কাঠের বেদী রচনা। পরমহংসদেবের বড় একখানা চিত্র থাকত তার ওপরে। পটের সামনে ধূপদানে ধূপ, দীপ, ফুল, ফলমূলের নৈবেদ্য। প্রথমে পাঠ হত 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবত' থেকে ঠাকুরের কথা, নির্বাচিত জীবনী অংশ, লীলা-মাহাত্ম্য। তারপর কতকাংশ শ্রীম কথিত শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। শেষে হরি সংকীর্তন। বক্তৃতা কিন্তু নেই। পাঠের ভার গ্রহণ করতেন উকীল বসন্তকুমার সেনগুপ্ত—এখনকার 'পরমপুরুষ'-রচয়িতা অচিন্ত্যকুমারের তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। অচিন্ত্যকুমারের উদাত্ত কণ্ঠ ও সাহিত্যানুরাগ যাঁরা জানেন তাঁরাও জানেন না ওসবে তাঁদের বংশগত অধিকার। অচিন্ত্যকুমার, বসন্তবাবুর ছেলে স্মরজিৎ আমার সমবয়স্ক হলেও তখন পর্যন্ত আমার অপরিচিত—তাঁরা ছিলেন 'পশ্চিমপ্রান্ত কুটিরের' বাসী, আমরা পূর্ববাসী। বসন্তবাবু দীর্ঘকান্তি সৌম্যমূর্তি পুরুষ—তাঁর উদাত্ত কণ্ঠ ছিল আরও মধুর। আমার বাল্যচিত্তে ধূপদীপ-জ্বালা সেই ভক্তি-শুদ্ধ আসরে পুঁথি পাঠের যে শান্ত গম্ভীর আদর্শ তিনি মুদ্রিত করে গিয়েছেন তার তুলনা নেই। পরবর্তীকালে তিনি আমাদের যুবকদের বহু উৎসবেরই ছিলেন আচার্য। সেসব দিনের কথা বলতে হলে সুসাহিত্যিক, সুবক্তা এই মানুষটির কথা আরও অনেক বলতে হবে। এই রামকৃষ্ণ উৎসবের কীর্তন পরিচালনা

চেয়ার পেতে দেওয়া হত। আমরা তাকে ঘিরে দাঁড়াতাম। তাঁর পুটলি নিয়ে টানাটানি করতাম, তাঁর লাঠি লুকিয়ে ফেলতে চেষ্টা করতাম। 'মামু'ও আপত্তি করে এ খেলায় যোগ দিতেন। বুড়ো ছুটে ধরবেন লাঠি-চোরকে। আঁকড়ে রাখবেন তাঁর পুটলি। কখনো কারো নাম জিজ্ঞাসা করবেন, আবার নতুন নাম দেবেন—কেউ 'গোলাপী', কেউ 'আয়েসা', কেউ 'গুলবাহু'। কখনো জিজ্ঞাসা করবেন "আস্‌গর আলী কেমনে লিখা যায়?" হিন্দুস্থানী উচ্চারণে বলতেন বাঙলা, মাঝে-মাঝে ফারসি-হিন্দুস্তানী শব্দ মিশিয়ে। মামুর কী নাম, কী ধাম, কেউ জানে না, ধর্মও না। আমাদের বাড়ি ছাড়া অন্য হিন্দু বাড়িতে খেতেন না বোধহয়—মুসলমানরা যথেষ্ট আদর করতেন। বলতেন 'ফকির'। কিন্তু তাঁদের কাছেও থাকতেন না। আমাদের বাড়িতে এলেই মেয়েরা জানতেন—মামু খাবেন। তাঁর জন্য পৃথক থালা বাসন ছিল—'মামুর থালাবাটি', অন্যের তা প্রাপ্য নয়। ঘরের বারান্দায় বসে মামু খেতেন। মুসলমানের এঁটো চাকর-বাকররা ছোঁবে না। মা-জ্যেঠাইমারা তা পরিষ্কার করবেন। কখনো-কখনো অনেক রাত্রে মামু বৈঠকখানায় এসে দুয়ার ঠেলতেন, তিনি ঘুমোবেন। উকিলের বৈঠকখানায় খান পাঁচ-ছয় তক্তপোষ জুড়ে ছিল বিস্তৃত ফরাস। মধ্যে শতরঞ্জির উপর তেমনি মস্ত মোটা চাদর। পুটলি থেকে কাপড় খুলে মামু তার ওপর নিজ বিছানা বিছিয়ে নিতেন। কখনো কখনো মাঝ রাতে কারো সঙ্গে যেন কথা বলছেন মনে হত। ভয়ার্ত চীৎকার করতেন, সবলে কিছু ঘোষণা করতেন দুর্বোধ্য কোন্ ভাষায়—আবার ক্রন্দনও করতেন সজোরে। দুপুরবেলা কদাচিৎ দেখা যেত পুঁটলির কাগজ খুলে মামু কিছু লিখছেন। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'মহাভারত', এক অক্ষরও বোঝা অসম্ভব। কারণ হরফ ফারসি। হয়তো লিখছেন হিন্দুস্তানী। এই মামু কি ছিলেন? নিশ্চয়ই মুসলমান। জ্যেঠামশায়ের মতে সাধু ফকিরের আবার হিন্দু-মুসলমান কী? মুসলমান হলেও শাহ সাহেব ছিলেন অন্যরূপ। সুদীর্ঘ দেহ, গৌরবর্ণ, তেজীয়ান পাঞ্জাবী বা পাঠান—বয়সের যাঁর ঠিকানা ছিল না। কিন্তু তিনি মুসলমানদের কাছে ঘেঁসতেন না। শুনেছি তিনি নাকি ছিলেন কালী ভক্ত। জেঠামশায় তাঁকে ভক্তি করতেন। অদ্ভুত ছিল শাহ সাহেবের প্রভাব—অত্যন্ত সচেতন, একেবারে অসাম্প্রদায়িক। মামু কিন্তু মুসলমান সমাজও ছাড়েন নি। তবে সেখানেও টিকতেন না। এই মামু? আমার এখনকার অনুমান সূফী ফকির কি? আধা পাগল?

হঠাৎ জেঠামশায় দেহত্যাগ করলেন। তার পরদিন থেকে এঁরা কেউ আর এলেন না। রাধানাথকে আর দেখি নি, মামুকেও দেখা যায় নি শহরে। কোথায় গেলেন তাঁরা সকলে? অনেকদিন—সম্ভবত বৎসর দুই বৈঠকখানার একটি বইএর আলমিরার ওপরে মামুর সেই পুঁটলি-কম্বল পড়েছিল। তারপর বাবা তা গরীব দুঃখীদের বিলিয়ে দিলেন। বললেন, "মামু আর আসবেন না—যে মানুষের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে সঙ্গে উনিও এ-বাড়ি ছেড়েছেন।"

জেঠামশায়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সেই সহজ সৌভাগ্য চিড় খেয়ে যায়। বাইরের ওই সাধু ফকিরের প্রভাব গতায়াত কমে গেল। মামুর থালা বাটিতে ধুলো জমতে লাগল, আর মাকড়সায় জাল বুনল। ডাক্তারখানার অমন ব্যবসা আপনার জোরে চলতে চলতে, ভেতরে বাইরে ধাক্কা খেতে খেতে, হাত ঘুরতে লাগল। বছর দশ-পনের পরে যখন তা উঠে গেল তখন আমরা হালদারেরা তার কেউ নই, তার খোঁজও পাই নি।

জেঠামহাশয় শুধু এই পরিবার-অতীত বৃহৎ পরিবারের মানুষ ছিলেন না, নিজের পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যেও ছিলেন বৃহৎ এই কথাটা জানিয়েই তাঁর কথা শেষ করতে পারতাম। তিনি অপুত্রক ছিলেন। তিন কন্যাকেই পাত্রস্থ করে যান—আর এমনভাবেই আমরা একসঙ্গে পালিত হয়েছি যে, আজও আত্মীয় বন্ধু অনেকেই জানেন না—আমরা সহোদর-সহোদরা নই। প্রথম জীবনে তাঁর আদর পেয়েছেন আমাদের বড় দাদা সুদর্শন—তাঁর সঙ্গে মাছ ধরবার সাথী হতেন প্রথম থেকেই এই ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁর স্নেহ আদরে আমরা যখন পাই তখন তিনি প্রৌঢ়—সকালে ছড়া আবৃত্তি করে বলি 'তেমি (তিমি) আপন শিকার ধরে।' সকাল বেলা ছোট চৌকিতে বসে হাত মুখ ধুতে ধুতে তিনি ডাক দিতেন, 'ওরে 'তেমি',—কই লিখবি না?' উঠোনের একদিকে তিনি মুখ ধুতেন আর আমি কাঠি দিয়ে লিখে যেতাম বাঙলা লেখা। একেবারে শেষদিকে আমার দ্বিতীয় সহোদর গৌর হত তাঁর সঙ্গী—সকালে-বিকালে তাকে সঙ্গে করে তিনি ডাক্তারখানায় যেতেন, খিদে পেলে ডাক্তারখানার রোগিদের কাউকে দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন।

তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সে কেন, আমরাও বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম। সে-ই আমার মৃত্যুর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। কিন্তু তখনো জানতাম তিনি স্বর্গে গেছেন।

(ক্রমশ)

মায়াবী সিঁড়ি ॥ কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সিঁড়ি একটা ধাপে-ধাপে উঠে গেছে :
সেখানে আলো নেই অন্ধকারও নেই
সেই সিঁড়িতে দেখলাম তোমাকে
দেখলাম বলা ভুল : অনুভব করলাম।
আমার চেয়ে কয়েক ধাপ এগিয়ে তুমি
তোমার চুলের ঝুমঝুমি
আর সমস্ত দেহের স্বাদ
বারবার অন্ধকার হাওয়ায়
আমাকে ছুঁয়েছে।

যেতে চাই তোমার কাছে
কে তুমি ? চিনি কি ? জানি কি ?
আবার উঠলাম কয়েক ধাপ
তবুও তুমি কয়েক ধাপ উপরে।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকালো :
ড্রেন-পাইপ ট্রাউজার-পরা একজন
এক গোছা নোট বাতাসে ভাসালো।
কে যেন বললো : রেসে ট্রিপ্‌ল্‌-টোট।
শুকনো কি তোমার ঠোঁট ?

উঠি আবার কয়েক ধাপ
আবার বিদ্যুৎ। দেখি :
গলিত—নখ-চর্ম এক বৃদ্ধ
উপরের দিকে সোনার বিছে-হার দেখায়।
আরো উঠি কয়েক ধাপ
কোথায় তুমি ?
আর তোমার রহস্য-ঘন চুলের ঝুমঝুমি ?

মনে হোলো এই বুঝি পেলাম তোমাকে
মায়াবী সিঁড়ি হেসে বলে : কাকে ?

আবার বিদ্যুতে
সেই ড্রেন-পাইপ-ট্রাউজার-পরা লোক
সেই সোনার বিছে-হার মাড়োয়ারি
হঠাৎ আমার দিকে ফিরে
হাত নাড়ালো
অন্ধকার বোবা স্বর বললো : তুমি না, তুমি না।

কে আমি ?
হঠাৎ ঘুম ভাঙলো।
রোদ উঠেছে।
বাজার যাবার, আপিস যাবার তাড়া।
ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে।
কোথায় সেই মায়াবী সিঁড়ি
আর তোমার চুলের ঝুমঝুমি ?

বৃক্ষ ॥ বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

ভারি ছুঃখ হয় বৃক্ষ—যখন তোমাকে
দেখি দিব্যি আছ স্থখে সম্রাটের মতো
ফুরফুরে হাওয়া খাচ্ছ শূন্তে অবিরত,
কখনো-বা স্পর্ধাবান মর্মরিত ডাকে।

সবতাতেই মাতামাতি মাতব্বরী চাল !
ইতস্তত ঠেলেঠুলে শরীর বিশাল
জ াকিয়ে বসেছ সমারোহে কাউকেই
গ্রাহ্য করছনা—যেন ভাবখানা এই :

থাকে থাক মাথা হেঁট—তাদের বাসনা,
কে গেল রইল বা কে কাড়লো অন্ধকার,
কার দাবি অনুকম্পা বা মৃছ্ সান্ত্বনা,
কার হতাদৃষ্ট-লিপি : ধাবিত কুঠার।

আপনাতে আপনিই সদা দিশাহারা।
সীমাহীন মাটি ছেড়ে তাই কি সম্প্রতি
আরো উঠতে চাও উর্ধ্বে আসমান-খাড়া ?
ভারি ছুঃখ হয় বৃক্ষ—দেখে অধোগতি !

অভ্রলতা ॥ স্থপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

অভ্রলতা, মুখ তোল ফুটিয়াছে নক্ষত্রের দল।
হিমেল নিদ্রার রাজ্যে যে-সকল মৃতের আবাস
তাদের স্মরণ ক'রে জীবিতেরা দেয় ফুল, ফল।
কেউ বন্ধু, কেউ শত্রু, নিদ্রার সাম্রাজ্য-জোড়া লাল।

আমরা নিদ্রায় জাগি, অভ্রলতা, গলন্ত আকার।
পাহাড় পেরুলে জাগে অন্তদেশ, অন্তনরনারী,
পোশাকে ঝিলিক অস্ত তাদের, কথায় বড় ধার ;
উপমায় বিদ্ধ তারা, চৈতন্য মানে না, নভোচারী।

অভ্রলতা, আমাদের যৌবন-কঠিন চলা-ফেরা
ব্যাহত হয়েছে আজ, তাই জাগি আমরা নিদ্রায় ;
নিকট হিমের গন্ধ, শৃঙ্খলিত মন চুল-চেরা
নিকরুণ অন্ধকারে, তারি স্বর নক্ষত্র-ছায়ায়।

অভ্রলতা, মুখতোল ফুটিয়াছে নক্ষত্রের দল।
মৃতেরে স্মরণ ক'রে এস দিই অশ্রু, ফুল, ফল।

হৃদয় নির্জন হলে ॥ পবিত্র মুখোপাধ্যায়

হৃদয় নির্জন হলে করতল রাখিও কুসুমে।……
কেন না নিসর্গে নেই ওর মতো মহান আশ্রয়,
প্রতিটি দলের গায়ে ভালোবাসা—কেবল ভ্রমর
জানে তাহা, মানুষেরা এখনও জানে না…জানিবে না।
ভালোবাসা এরকম কেহ আর কৃতাঞ্জলি পুটে
ধরেনা, করেনা দিবাঅবসানে শব্দহীনতায়।
এরকম আত্মদান আমাদের লজ্জার বিষয়।
(কীটসম নিষ্ঠুরতা ঘটেনা কি কুসুম চয়নে ?)
ফুলদল,—হে আমার ক্ষণিকের অতিথি অম্লান।
কে আর বুঝিতে পারে মানুষ বা দেবতা তোমার
মহিমা ? এখনো তাই স্পর্শ রাখে, নির্জনে বিরলে
করে কী বিধুর ম্লানকোমলতা ? আসে কি নয়নে
বিষাদের অশ্রুবিন্দু ? আত্মদানে নির্জন সাধনা
দেখে কি বেদনাসিক্ত করতল রাখিয়া কুসুমে ?

অবিরাম প্রতিধ্বনি ॥ আশিস সান্যাল

অবিরাম প্রতিধ্বনি। মানুষের নির্ভীক হৃদয়
অন্ধকার থেকে দূর নক্ষত্র সন্ধানে
হেঁটে যায় নিরবধি। বিগত শৈশব মনে হয়
আঁধারে বিনষ্ট এক প্রবীণ বেদনা।
শিমূলের মতো ভ্রষ্ট। দূরবর্তী যে কোনো চেতনা
সংশয় বিচ্ছিন্ন স্থির মোহন রূপসী।
যাবতীয় অন্ধকার নিভে গেলে একদিন প্রান্তরের পর
যেমন আনন্দ জাগে অবারিত রমণীর মতন বিহ্বল
স্বাভাবিক অভিসারে…দেখেছি সে নিরভ্র প্রতিমা
সবুজের মতো মুগ্ধ আজো এক সুস্পষ্ট কুটিরে।

কে তবে বাজায় বীণা পশ্চাতের মর্মর উদ্যানে।
ভালোবাসা নামে কার উদ্যত ছলনা
নৈঃশব্দ নিকটে ডাকে ? সূর্যাস্তে মলিন শিখা কবে
দেখেছে সে অবিশ্বাসী পর্বতে, সমীরে।
মানুষ জন্মের আগে এরকম অদ্ভুত বেদনা
বিবিধ আদিম রক্তে তুলেছিল ধ্বনি। হায়-রে জীবনে
তবুও অন্তিম দৃশ্যে উজ্জ্বলতা নামক রমণী
প্রাঞ্জল হলুদ বৃক্ষে মনোরমা ভাদুড়ীর মতো
অমৃতের অভিজ্ঞানে পূর্ণ করে মঙ্গলের সম্পূর্ণ গাগরি।

সজীব চেতনা ছাড়া দীপ্রতর যেন আর প্রতিশ্রুতি নেই।
একদিন অভিশাপ দৃপ্ত মনে হয়। তারপরে কখন আঁধারে
জাগে এক বিকশিত নিবিড় প্রার্থনা।
সম্ভ্রান্ত তৃষ্ণার ছবি ক্রমাগত দূরের প্রাঙ্গণে
গহন প্রেরণা যেন মুক্ত করে। পার্থিব নীলিমা
সাধারণ দীপ্ত হয়। পরিণত নির্জন অন্তিমে
জাগে স্থির প্রতিচ্ছবি সমুদ্রের ব্যাপক আভাসে।

মার্কসের শিল্পমানস ও সোভিয়েত শিল্পবিভ্রাট

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

মার্কস বলেছেন যে বহিঃপ্রকৃতির গতিশীলতা, এমনকি সমাজজীবনের প্রবাহ যে নিয়মের ছন্দ মেনে চলে, মানুষের চিন্তলোকের গতিশীলতা সেই একই নিয়মে চলে না। শিল্পসাহিত্যের বিষয় ভাবের জগৎ। সামাজিক অঁস্তিত্বের সঙ্গে ভাবের জগতের যোগাযোগ হয়তো আছে। তবু পরিণত ফল হিসেবে ভাবের জগৎ-এর আছে স্বকীয়তা, স্বতন্ত্র প্রকাশ। জন্ম বৃত্তান্তের দিক থেকে ভাবের জগৎ সামাজিক অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত, সমাজজীবনের উপর নির্ভরশীল। অথচ এও সত্য যে সমাজ-অস্তিত্বকে অতিক্রম করে এই জগৎ সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে, নিজস্ব নিয়মে চলে। ইডিওলজির আলোচনাপ্রসঙ্গে এঙ্গেল্‌স্‌, "Ludwig Feurbach" এ-কথাই বলতে চেয়েছেন। "Every ideology, however, once it has arisen, develops in connection with the given concept material, and develops this material further ; otherwise it would not be an ideology, that is, occupation with thoughts as with independent entities, *developing indepedently and subject to their own laws*,"।[১] (বাঁকা হরফ প্রবন্ধকারের)

মার্কস-এঙ্গেলস বলেছেন যে মানুষের 'সামাজিক জীবন' সাধারণভাবে সমাজের 'মানসলোক' নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাকৃত মার্কসবাদীরা 'নিয়ন্ত্রণ' পদটির কদর্থ করে যন্ত্রবিদ্যায় ব্যবহৃত কার্যকারণ সম্পর্কে রূপান্তরিত করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে বাস্তবজীবন হল 'কারণ'—সকল ক্রিয়ার আধার। অন্যদিকে 'মানসলোক' শুধুই কার্য—নিষ্ক্রিয়তার জগৎ। 'বাস্তবজীবন মানসলোক নিয়ন্ত্রণ করে' এই মার্কসীয় বাক্যটির ব্যাখ্যা করে এঁরা বলেন যে বাস্তবজীবন বিশেষ অর্থে যথার্থ, কিন্তু 'মানসলোক' একান্তভাবেই বাস্তবজীবনাশ্রিত। অথচ এঙ্গেলসও সুস্পষ্টভাবে এ ব্যাখ্যার খণ্ডন করেছেন। "Political, juridical, philosophical, religious, literary, artistic etc., development is based

on economic development. But all these react upon one another and also upon the economic base. It is not that the economic position is the cause and alone active, while everything else has a passive effect. There is rather interaction on the basis of economic necessity which ultimately always asserts itself।"[২]

'বাস্তব জীবনযাত্রাপদ্ধতি' ও 'শিল্পসৃষ্টি'র মধ্যে যে কোনো আনুপাতিক সম্পর্ক নাও থাকতে পারে এ কথা মার্কস-এঙ্গেলস জানতেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, গ্রীসের সামাজিক অবস্থা ছিল অনুন্নত, primitive, অথচ গ্রীকশিল্পের আবেদন কালাতীত—সর্বজনীন। দাসশ্রম-নির্ভর অনুন্নত গ্রীক সমাজে মহৎশিল্প কেমন করে সম্ভব হল এ প্রশ্ন নিয়ে মার্কস মাথা ঘামিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত বলেছেন যে সমাজজীবনের সঙ্গে ভাবলোকের সম্পর্ক গণিতের অনুপাতে ঘটে না। এবং সেজন্যে সমাজ-বাস্তবতাকে অতিক্রম করে ভাবসম্পদ, যথা মহৎশিল্প, সাহিত্য, সর্বকালে প্রসারিত হয়, সর্বকালীন তাৎপর্য লাভ করে।

গ্রীক শিল্পপ্রসঙ্গে মার্কস বলেছেন—

"The charm their art has for us does not conflict with the primitive character of the social order from which it had sprung. It is rather the product of the latter and is rather due to the fact that the unripe social conditions under which the art arose and under which alone it could appear could never return।"[৩]

গ্রীকশিল্পের যুগ ইতিহাসের প্রবাহে দীর্ঘকাল হল অন্তর্হিত হয়েছে, কিন্তু গ্রীক শিল্প কালজয়ী মহিমায় ভাস্বর। ফলে মার্কস বলছেন, বাস্তব উৎপাদন ও শিল্পসৃষ্টির মধ্যে অনুপাত দেখা না গেলে বিস্মিত হয়ো না।

সমাজজীবনের সঙ্গে ভাবলোকের যান্ত্রিক কার্যকারণ সম্পর্ক যে নেই, তার উদাহরণ হিসাবে, এঙ্গেলস ১৮ শতকের জার্মান সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করেছেন। জার্মানীর ইতিহাসে ১৮ শতক মনীষার ইতিহাস। অথচ জার্মান সমাজের সর্বত্র তখন পচনশীলতার অভ্রান্ত স্বাক্ষর। ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিল্পে, কৃষিতে, সর্বত্র জার্মানীর তখন চরম দুর্দশা। তৎকালীন জার্মানীর রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে এঙ্গেলস বলেছেন লজ্জাজনক, shameful। অথচ

এ হেন যুগে জার্মানীর সাহিত্যে স্বর্ণযুগের আবির্ভাব। ১৭৫০ সালের কাছাকাছি থেকে জার্মানীর মহামনীষীদের অভ্যুদয়—দর্শনে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, তখন অপূর্ব মানসিক ফসলের সমারোহ।

"Such was the state of Germany towards the end of the last century. It was all over one living mass of putrefaction and repulsive decay...

This shameful political and social age was at the same time the great age of German literature. About 1750 all the master spirits of Germany were born, the poets Goethe and Schiller, the philosopher Kant and Fichte and hardly twenty years later the last German metaphysician, Hegel।"[৪]

এমনিতরো আরও উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করা চলে যে মার্কস এঙ্গেলস, বিশেষতঃ মার্কস, সমাজজীবনকে দেবতার আসনে বসিয়ে ভাবলোককে শুধুই সমাজজীবনাশ্রিত আকাশকুসুম হিসেবে বিচার করেন নি। পক্ষান্তরে, মার্কসবাদের আদি গুরুরা বলেছেন যে সমকালীন সমাজজীবনের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে মহৎ শিল্পসাহিত্যের কোনো প্রত্যক্ষ, একান্ত সংযোগ যদি না দেখা যায় তবে বিস্ময়ের কিছুই নেই। বিস্ময়ের কিছু নেই এ জন্যে যে ভাবলোক 'শেষ পর্যন্ত', 'সাধারণভাবে'ই শুধু বাস্তব জীবনযাত্রাপদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। ভাবলোকের বিশিষ্ট রূপটি কেমন হবে, শিল্পীসাহিত্যিকের মানসমুকুরে বাস্তব কেমনভাবে প্রতিফলিত হবে এ সব প্রশ্নের সদুত্তর পেতে হলে শিল্পীমানসের ক্রমাভিব্যক্তি, শিল্পী ও ঐতিহ্যের সম্পর্ক, শিল্পীমনস্তত্ত্ব, সৌন্দর্যবিজ্ঞানের নানা খুঁটিনাটির আলোচনায় যেতে হবে। শুধু তাই নয়। শিল্পী তো প্রজাপতির সমগোত্রীয়, ভাবলোকের স্রষ্টা। এবং সৃষ্টির নৈপুণ্য অনেকখানিই ব্যক্তি-প্রতিভার উপর নির্ভরশীল, যে প্রতিভার পরিচয় মেলে অপূর্ববস্তুনির্মাণ-ক্ষমতায়, রসের আনন্দলোকে। কথাটাকে ডায়ালেকটিকের উপমা দিয়েও প্রকাশ করা চলে। পদ্মফুল পঙ্ক হতে জাত তবুও এ ফুল শুধু তো পঙ্ক নয়, আরও কিছু। 'পঙ্ক হতে জাত' হয়েও পদ্মফুল পঙ্কিলতাকে অতিক্রম করে যে স্বকীয় সুষমায় মণ্ডিত হয়ে ওঠে, এতো আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার কথা। তেমনি বলা যায় যে, ভাবলোক 'বাস্তবজীবন হতে জাত' হয়েও বাস্তবজীবনাতীত আস্বাদ্যমানতায় মনোহারি হয়ে ওঠে। এই মনোহারিত্বের

আশ্রয় শিল্পীসাহিত্যিকের মনোভূমি যার বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্যের কথা মার্কস বারবার বলেছেন।

দুই

মার্কস দেখেছেন মানুষের দ্বৈতরূপ। একদিকে মানুষ প্রকৃতিরই অংশবিশেষ, আশু প্রয়োজনের বৃত্তে ঘুরে ফেরাই যার কাজ। এ রূপকে মার্কস নাম দিয়েছেন 'জৈবরূপ'—natural existence। এই জৈবরূপকে পেরিয়ে মানুষের মধ্যে যে সত্তা আছে, সে সত্তা মানবিক, 'human existence'। জীবসত্তার সীমা ছাড়িয়ে, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, সমাজ-আশ্রয়ে, এ সত্তার বিকাশ। প্রকৃতিরও দুটি রূপ মার্কস স্বীকার করেছেন। একদিক থেকে প্রকৃতি শুধুই প্রাকৃত, বর্তমানে অধিষ্ঠিত, ইতিহাস-অক্ষত, প্রত্যক্ষ গোচর। এ হেন বহিঃপ্রকৃতি অবশ্যই প্রাগৈতিহাসিক, ক্রমবিলীয়মান। অস্ট্রেলিয়ার নতুন আবির্ভূত কয়েকটি প্রবালদ্বীপে ছাড়া এরকম অস্পৃষ্ট, শুদ্ধ, অশিল্পবিদ্ধ প্রকৃতির পরিচয় সম্ভবই নয়। অন্যদিকে প্রকৃতিরও আছে মানবিক রূপ (human essence of nature)। মানুষের জ্ঞানকর্মের বিষয় হিসাবে এই প্রকৃতিই বাস্তব। এই মানবিক প্রকৃতির রয়েছে অখণ্ড বিস্তার, আছে 'ঐতিহাসিক', প্রবহমান বিচিত্ররূপ। ফয়েরবাখের সমালোচনা করে মার্কস বলছেন, প্রকৃতির এই মানবিক রূপই আসল রূপ, শুদ্ধা প্রকৃতির অস্তিত্ব ক্রমশঃই বিলীয়মান।

"He does not understand how the sensuous world around him is, not a thing given direct from all eternity, ever the same, but the product of industry and of the state of society... Even the objects of the simplest 'sensuous certainty' are only given him through social development, industry and commercial intercourse. The cherry-tree, like almost all fruit trees, was, as is well-known, only a few centuries ago transplanted by commerce into our zone, and therefore only by this action of a definite society in a definite age provided for the evidence of Feuerbach's senses"।[৫]

অর্থাৎ যাকে আমরা 'বাস্তব', 'প্রত্যক্ষগোচর' জগৎ বলি সে জগৎ মনুষ্য-

জ্ঞানকর্মাশ্রিত শিল্পবাণিজ্যসৃষ্ট, ইতিহাসগত জগৎ। মানুষের শ্রমে, সামাজিক বিকাশের মাধ্যমে গড়ে-ওঠা এই জগতে বস্তুসম্ভার পুঞ্জীভূত হয়েছে, নিজেকে যেন বিষয়গত (objectification) করেছে মানুষ। তবু এ জগতের সঙ্গে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আদর্শ-স্বপ্নের যেন কোনো যোগই নেই। এই অচিনপুরীর রুদ্ধ কারায় মানুষ আজ বন্দী। মানবস্বরূপ ভ্রষ্ট হয়ে 'শুধু দিন যাপনের গ্লানি' বয়ে বেড়ানোটাই যেন এ জগতে মানুষের কাজ।

"This crystallisation of social activity, this consolidation of what we ourselves produce into an objective power above us, growing out of our control, thwarting our expectations, bringing to naught our calculations, is one of the chief factors in historical development up till now।"*

মানবশ্রমের ফলে, যন্ত্রশিল্পের মাধ্যমে বিকশিত মানুষের 'সৃষ্টি', স্রষ্টাকেও ছাপিয়ে উঠেছে। এই বিপুল সৃষ্টি আলাদিনের গল্পের ছাড়া পাওয়া দৈত্যের মতো স্রষ্টাকে বন্দী করতে উদ্যত। অথচ আজ সৃষ্টি হয়েছে একদিকে মানবিকতামণ্ডিত বিশ্বপ্রকৃতি, অন্যদিকে স্রষ্টার বিশ্বগত হয়ে পূর্ণতা লাভের সম্ভাবনা। মানুষ ও প্রকৃতির দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে এ সত্যই ক্রমশঃ উদ্ভাসিত হচ্ছে। সমাজবিকাশেরও এটি আসল কথা। ছাড়া পাওয়া দৈত্যশক্তিকে বাগ মানাতে হবে। তবেই দেখা যাবে এ শক্তির আছে মানবিক শ্রী। এবং এই মানবিক শ্রীমণ্ডিত জগতে মানুষ বিশ্বগত হয়ে তখনই আত্মস্বরূপকে লাভ করবে।

তিন

যৌবনে মার্কস 'Economic and Philosophic Manuscripts—1844' লিখেছিলেন। মস্কো থেকে অতি বিলম্বে ১৯৬১ সনে এ পুস্তকটি অনূদিত হয়েছে। অথচ মার্কসের দার্শনিক কমিউনিজমের রূপ ও অভিব্যক্তির আলোচনায় পুস্তকটির গুরুত্ব অসামান্য। মার্কসের জীবনবেদে যে মানবিক মূল্যবোধ ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, সেই মূল্যবোধের প্রকাশ পুস্তকটির ছত্রে ছত্রে।

মার্কস দেখেছেন যে শ্রমবিভক্ত, অর্থলোলুপ সম্পত্তিকেন্দ্রিক সমাজে মনুষ্যত্ব, মানবতা সীমা ও তুচ্ছতার বাঁধনে পীড়িত ও অবমানিত। সৌন্দর্যের

প্রকাশ নেই এই আধুনিক সম্পত্তিক-সমাজে। সামাজিক কর্মে (সে কর্ম অর্থনৈতিক উৎপাদনই হোক কিম্বা শিল্পচর্চাই হোক) আজ যদিও বিশ্বানুগ হয়ে ওঠার বাস্তব সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তবু এই সম্পত্তিক-সমাজে দেহে দেহে জীব স্বতন্ত্র, 'অহংমমাভিমান,' 'মালিকানা' প্রভৃতির প্রভাবে ব্যক্তিসীমায় সীমিত। জীবনের প্রকাশধর্মিতার যা আসল রূপ—অর্থাৎ প্রয়োজনাতীত প্রেম ও সৌন্দর্য, সেরূপ এ সমাজে নেই। এ সমাজে পুঁজি মহারাজ ('My Lord Capital') লোভের মোহে বাঁধা ; আর শ্রমজীবী সাধারণ শ্রমবিভাগ ও শোষণের শিকলে বাঁধা। এই অসুন্দর যন্ত্রপুরীর বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেছেন মার্কস। একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

"Private property has made us so stupid and onesided that an object is only ours when we have it, when it exists for us as capital or when we possess it directly, eat it, drink it, wear it out on our body, live in it, in short use it.··· For all the physical and spiritual senses, therefore, the sense of *having*···has been substituted।"*

মার্কস বিশ্বাস করেছেন যে এই শ্রমবিভক্ত, অসুন্দর জগতের যূপকাষ্ঠে মনুষ্যস্বরূপ বলি হয়েছে, 'মানবিক প্রকৃতি'কে (humanism of nature) আপন করে নিয়ে আনন্দ ও সৌন্দর্যোপলব্ধির পথে মানুষ সর্বজনীন হয়ে উঠতে পারে নি আজও। অথচ মার্কস বরাবরই ভেবেছেন যে শোষণ ও শ্রমবিভাগের অবসান হলে স্বাধিকারলব্ধ মানুষ নতুন স্বরূপে অধিষ্ঠিত হবে, যে স্বরূপে সৃজনশীল কর্মের ও মুক্তির অপার আনন্দ অনুক্ষণ মানুষকে বিশ্বানুগ করে তুলবে। যুবক মার্কস এই স্বপ্নের কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন :

'Manuscripts—1844'-এ মার্কস লিখেছেন—

"Man, much as he may therefore be a particular individual (and it is precisely his particularlity which makes him an individual, and a real *individual* social being), is just as much a totality—the ideal totality—the subjective existence of thought and experienced society present for itself ; just as he exists also in the real world as the awareness and the real enjoyment of social existence, and as a totality of human life activity।"*

বাহ্যজগৎ যে এক অর্থে 'মানুষেরই জগৎ', মানুষের কর্ম ও অনুভবশক্তির পরিসর অনুযায়ী এ জগৎ যে তার বিশেষ রূপ ও আকৃতি লাভ করেছে, মার্কস সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। অন্যদিকে মার্কস একথাও জানতেন যে মানুষের কর্ম ও অনুভবশক্তির পরিসর আজও নেহাৎই সংকীর্ণ—বিষয়বুদ্ধি, ক্ষমতালিপ্সা, লোভ ও শোষণের শৃঙ্খলে বাঁধা। আত্মচ্যুত জীবসত্তা যে মানবিক জীবন-কর্মের (human life activity) মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ মনুষ্যত্বের আদর্শকে রূপায়িত করে,—নিজের স্বরূপকে আবিষ্কার করে বিশ্বজনীনতার সাধনা করবে (individual social being) এ সত্যও মার্কস স্বীকার করেছেন। সেই বিশ্বজনীন পূর্ণতাকে পাবার সাধনাই মানুষের পরম-ইষ্ট এবং এই ইষ্টলাভের উপায় হিসাবেই মার্কস কমিউনিস্ট সমাজের কথা ভেবেছেন। যৌবনে মার্কস Manuscripts-এ লিখেছেন :

"Communism as the positive transcendence of private property, as human self-estrangement, and therefore as the real *appropriation of the human* essence by and for man; communism therefore as the complete return of man to himself as a social (*i e.*—human) being—a return become conscious and accomplished within the entire wealth of previous development।"[৯]

অর্থাৎ, 'Appropriation of human essence', 'return of man to himself as a social (*i. e.* human) being', "transcendence of human self-estrangement"—এই হল মার্কসের ইষ্ট। কিন্তু, শ্রমবিভক্ত, সম্পত্তিকেন্দ্রিক সমাজে মনুষ্যস্বরূপের খণ্ডিত প্রকাশ। অতি ক্ষুদ্র তুচ্ছাতিতুচ্ছ কর্মে মানুষ সারাজীবনই হয়তো বাঁধা। "He is a hunter. a fisherman, a shepherd, or a critical critic, and must remain so if he does not want to lose his means of livelihood।"[১০]

চার

'কমিউনিজম্'-কে মার্কস উপায় (means) হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন কেন? মার্কস আশা করেছিলেন যে কমিউনিজমে জীবসত্তার সামাজিকতা

(মানবিকতা) পূর্ণতা লাভ করে; এই ব্যবস্থায় শ্রমবিভাগমুক্ত মানুষ স্ব-স্বরূপকে লাভ করে সার্থক হয়ে ওঠে, যন্ত্রবৎ-চালিত জীবনকে পিছনে ফেলে, কমিউনিজমে, মানুষ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় মানবীয় স্বরূপে (human essence)। মার্কস এও জানতেন যে মানুষ 'প্রকৃতি-সমাজে'র জগতে জন্মলাভ করে প্রকৃতি-সমাজের জগতের বাইরে একটি নিজস্ব জগতও সৃষ্টি করে নেয়। আহার অন্বেষণ, আশ্রয় খোঁজা, পরিবেশকে জানা, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো, বংশরক্ষা প্রভৃতি ধর্মের দিক থেকে বিচার করলে, মানুষে পশুতে খুবই একটা পার্থক্য নেই। মানুষ যতক্ষণ সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক নিয়মবন্ধনের দাস, ততক্ষণ সে পশুদের সঙ্গে শুধুই প্রয়োজনের সীমায় বাঁধা। যেই প্রকৃতির (তথা সমাজের) অন্ধ অচেতন নিয়মের বাঁধন কাটিয়ে মানুষ সচেতন ভাবে কাজ করতে শুরু করল, অমনি সে শুরু করল নিজস্ব একটি জগৎ তৈরী করতে। এ জগৎ প্রয়োজনাতিরিক্ত, চেতনানিয়ন্ত্রিত—উদ্দেশ্যের,—ভাব-লোকের জগৎ।

'Capital'-এ মার্কস এ কথাটি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছিলেন :

"What distinguishes the worst architect from the best of bees is this, that the architect raises his structure in imagination before he erects it in reality. At the end of every labour process, we get a result that already existed in the imagination of the labourer at its commencement. He not only effects a change of form in the material on which he works but he also realises *a purpose of his own* that gives the law to his modus operandi।"[১১]

'স্বকীয় উদ্দেশ্য অনুযায়ী চলা', 'আছে'-র জগৎ (change of form in the material) থেকে 'উচিতে'-এর—ইষ্টের জগতের দিকে অগ্রসর হওয়া (realises a purpose of his own) এই তো মানুষের সাধনার নিয়ম (gives the law to his modus operandi)। চেতনানিয়ন্ত্রিত, উদ্দেশ্যাভিমুখী 'কর্মের জগত' সম্পর্কে মার্কস অন্যত্রও আলোচনা করেছেন। মানুষ যে মৌমাছি নয়, কীটপতঙ্গ নয়, অশিক্ষিতপটু জন্তু থেকেও যে মানুষ আলাদা, একথা যেন আমরা সবদা স্মরণ রাখি। প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ অবশ্য কাজ করে, সে কাজ আশু প্রয়োজন মেটাতেই ব্যস্ত। সে কাজ তাই

নেহাৎই একপেশে, সংকীর্ণ। তবুও মনে রাখতে হবে যে মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তি যখন বাধামুক্ত হয়ে প্রয়োজনের সীমার বাইরে সৃষ্টি করে, তখন মানবসৃষ্টি সর্বমানবে ও সর্বকালে প্রসারিত হয় (man produces universally)। এই প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ আছে বলেই মানুষ কীটপতঙ্গ ও জন্তুদের থেকে স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্রতা, চেতনার এই প্রাচুর্য,—মানুষের বেলায় অভিব্যক্তির পথ খোঁজে। শিল্পকলায়, সাহিত্যে মানুষ সুন্দরের সাধনা করে, প্রকৃতি ও জীবনকে মনের মাধুরী মিশিয়ে মনোহররূপে সৃষ্টি করে (creates according to the laws of beauty)। শিল্পে সাহিত্যে মানুষ প্রকাশ করে তার মানবিক স্বরূপকে, যে স্বরূপ সুন্দর। বিষয়কে রূপকলার মাধ্যমে সুন্দর আকৃতি দিয়ে এই স্বরূপ চরিতার্থতা লাভ করে (can supply the inherent measure of the object)। এ সব বক্তব্য মার্কসের নিজেরই।

"To be sure animals also produce. They build nests, dwellings etc., like the bees, beavers, ants and others. But they only produce for their own or their offspring's immediate needs ; they produce one-sidedly, *while man produces universally* ; they produce only under the domination of immediate physical needs, while man produces independently of physical needs and really produces only when free of these needs. They produce only for themselves, while man reproduces all nature ; their product belongs directly to their own physical body, while man *freely* faces his product. Animals create only according to the measure and need of the species while man can produce according to the measure of every species and can everywhere supply the inherent measure of the object. *Hence man also creates according to thu laws of beauty*।"[১২]

'Man produces universally'—'মানুষের সৃষ্টিকর্ম সর্বমানবে ও সর্বকালে প্রসারিত হয় ; 'অপ্রয়োজনের ফসল হিসাবে 'সুন্দর'কে সৃষ্টি করে মানুষ', 'সুন্দরের নিয়মকে মেনে', 'man creates according to the laws of

beauty' ; বিষয়ের,—সৃষ্টবস্তুর মানুষ দাস নয়, কেননা মানুষ বিষয়কে চেতনা-সম্পদে স্বাধীনভাবে রূপের বাঁধনে আনে (freely faces his product), এ হেন স্বতন্ত্র, স্বাধীন, স্রষ্টা মানুষের জয়গান মার্কস সর্বত্র গেয়েছেন।

আর্টে, সাহিত্যে সুন্দরই যেহেতু পরম-ইষ্ট, প্রয়োজনাতীত মানবীয় সৃষ্টি-প্রেরণা যেহেতু শিল্পসৃষ্টির মূল কথা, সেই হেতু মার্কস ফরমায়েসি শিল্পসাহিত্য-প্রসঙ্গ নিয়ে পরিহাসরসিকতাই করেছেন। 'সাহিত্যচর্চার আগে জীবিকা' একথা মার্কস স্বীকার করেছেন। কিন্তু জীবিকার জন্যে যে সাহিত্যিক লেখেন, তিনি যে স্বধর্মভ্রষ্ট এ বিষয়ে মার্কসের কোনো সন্দেহ নেই। কেননা সাহিত্য-শিল্পের স্বকীয় মূল্য আছে। সমাজকল্যাণ, নীতিউপদেশ, পার্টিয়তা (আধুনিক দাবী), এমনিতরো কোনো বহিরঙ্গ দাবির কাছে সাহিত্যশিল্প যে মাথা নত করতে পারে না, প্রকৃত শিল্পীদের জীবনই তার প্রমাণ। মার্কস শিল্পসাহিত্যের উপকরণমূল্যকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে, এর চরমমূল্যকে বিকৃত করবার প্রয়াস পান নি। সংস্কৃতিপ্রেমিক ও সাহিত্যরসিক মার্কসের পক্ষে এ হেন অর্বাচীনতা প্রত্যাশিতও নয়। তাই মার্কস বলেছেন :

"The writer in no way regards his works as a *means*. They are *ends in themselves* ; so little are they a means for him and others that, when necessary he sacrifices *his* existence to theirs।"[১৩]

আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার নেতা মার্কস শিল্পীর স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেছেন, সুন্দরের প্রকাশে পার্টি-নায়কতার নিয়মকে স্বীকার না করে 'সুন্দরের নিয়মাবলী' আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। মার্কস ঠাট্টা করে বলছেন, গোলাপ-ফুল ভায়োলেট ফুল থেকে আলাদা। এই স্বতন্ত্রতায় যখন আপত্তির কিছু নেই তখন ভাবলোকের প্রকাশ বৈচিত্র্য দেখে আঁৎকে ওঠার হেতু কি ? মার্কস বলেছেন :

"You do not demand that a rose should have the same scent as a violet, but the richest of all, the spirit, is to be allowed to exist in only one form ?"[১৪]

সকলধনে-ধনী মানবাত্মাকে মার্কস বহুতন্ত্রী বীণা হিসাবেই দেখেছেন। ফলে মার্কস বলছেন, এ হেন সর্বৈশ্বর্যময়ী বীণাকে যাঁরা দীনহীন একতারায় পরিণত করতে চান, তাঁরা সাহিত্যশিল্পের মহাধর্ম হতে ভ্রষ্ট। সাহিত্য-

দিঙ্‌নাগদের ফরমায়েসি সাহিত্যের অপকর্ষ ব্যাখ্যা করে মার্কস আরও বলছেন :

"I am a humourist, but the law orders me to write seriously. I am bold but the law orders my style to be modest. Gray and more gray, that is the only authorised colour of freedom।"[১৫]

মার্কস বলছেন : 'প্রত্যূষের সূর্যকিরণস্নাত শিশিরকণিকার বর্ণসমারোহ দেখে যদি আমরা মুগ্ধ হই, তবে আত্মার ভাস্বর সূর্যকিরণ যদি ব্যক্তির ও বস্তুর বিচিত্র প্রকাশধর্মিতায় অভিব্যক্তি লাভ করে, তবে অনুযোগ কেন ?'

"Every dewdrop in which the sun is reflected, glitters with an inexhaustible display of colours, but the sun of the spirit may break up into ever so many different individuals and objects, yet it is permitted to produce only one colour, the *official colour*।"[১৬]

পাঁচ

মার্কসীয় মানসের উদার বিস্তৃতির পরিচয় মার্কসের লেখায় ভূরি ভূরি মেলে। কোনো লঘু চপলতা, কোনো শাস্ত্রগত সংস্কারকে মেনে চলেন নি বলেই মার্কস বলতে পেরেছেন "সব কিছুকেই সন্দেহ করতে শেখো" (doubt everything)। মানুষের সাধনার ইতিহাসে মানবতার নামে ও লব্ধস্বরূপ ব্যক্তির নামে মার্কস দাবি রেখেছেন। বলেছেন : "The essence of the spirit is always truth itself।" সত্যই মানবজীবনের সারাৎসার। সেই সত্যকে জানবার জন্যে একদিকে মার্কস যেমন আধুনিক সমাজের গতিশীলতার স্বরূপ বুঝতে চেয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি ভাবলোকের স্বকীয়তারও আলোচনা করেছেন।

মার্কসের কলারসিকতার অব্যর্থ প্রমাণ এই যে তিনি ভবিষ্যৎ সমাজের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই সমাজের চিত্র অনেকখানিই শিল্পীর চোখে দেখা। মার্কস ভেবেছিলেন, কমিউনিস্ট সমাজে শ্রম রূপান্তরিত হবে আত্ম-ক্রিয়ায় (self-activity) এবং সর্ববন্ধনমুক্ত মানুষ পূর্ণপুরুষ হিসাবে বিকাশলাভ করবে। এ সমাজে মানুষ শ্রমবিভাগের দাস হবে না, আনন্দের যোগে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বিভিন্ন কর্মে লিপ্ত হবে। মার্কস বলেছেন :

"In communist society, where nobody has one exclusive sphere of activity but each can become accomplished in any branch he wishes, society regulates the general production and thus makes it possible for me to do one thing today and another tomorrow, to hunt in the morning, fish in the afternoon, rear cattle in the evening, criticise after dinner, just as I have a mind, without ever becoming hunter, fisherman, shepherd or critic."[১৭] এ হল কবি মার্কসের কথা, মানুষের স্বচ্ছন্দ বিহারের কথা যিনি বারবার বলেছেন।

জীবনচর্চার সকল ক্ষেত্রে মহিমময় মানুষ, জ্ঞানে, কর্মে, স্নেহপ্রেমপ্রীতিতে, সুন্দরের সাধনায়,—সার্থক মানুষ, এ হেন মানুষের চিন্ময়মূর্তির বর্ণনা মার্কস করেছেন। শিল্পী-সাহিত্যিক অন্তর্লীন প্রেরণা থেকে সাহিত্যকর্মে, শিল্পকর্মে জীবনের বহুবিচিত্র রূপকে নানা রং-এ, নানা বর্ণে চিত্রিত করে মনোহর রূপ দেন, মানবচৈতন্যকে চমৎকারিত্বের আস্বাদে আপ্লুত করে দেন। শিল্পে, সাহিত্যে মানবিকতা ও সর্বজনীনতাই মহত্ত্বের চিহ্ন। এই দ্বিবিধ গুণের অভাবে শিল্প-সাহিত্যচর্চা সমকালীনতার ছোট্ট পরিসর অতিক্রম করে কালজয়ী মহিমায় ভাস্বর হতে পারে কিনা সন্দেহ। এ সব বক্তব্য মার্কসের শিল্প-সাহিত্য দর্শনে প্রাপ্তব্য। এবং মার্কসের সর্বজনীন সাহিত্যরুচি ছিল বলেই তিনি হাইনে ও গ্যেটের কবিতা অনর্গল আবৃত্তি করতে পারতেন, বিভিন্ন য়ুরোপীয় ভাষার কবিদের কাব্য নিয়মিত পাঠ করতেন, মূল গ্রীক ভাষায় ইসকাইলাস পাঠ করতেন, শেক্‌সপীয়ার সম্পর্কে ছিলেন উচ্ছ্বসিত।[১৮] কেননা মানবিক, কলারসিক মার্কস য়ুরোপীয় এনলাইটেনমেন্টেরও ছিলেন উত্তরসাধক এবং সেজন্যে মার্কসীয় শিল্পদর্শনের মধ্যমণি : প্রবুদ্ধ মানুষ, স্রষ্টা মানুষ।

মার্কস আত্মচ্যুতি (self-estrangement) ও আত্ম-আবিষ্কারের (self-discovery) পটভূমিকায় প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজের প্রশ্ন তুলেছিলেন। অর্থনৈতিক শোষণে যেমন মানুষের পূর্ণঅভিব্যক্তি সম্ভব নয়, তেমনি, শ্রমবিভাগ, টাকার দাসত্ব, লোভ, পরবশ্যতা—এ সবই মানবীয় সত্তাকে যে খণ্ডিত করে রাখে, মার্কস তা স্বীকার করেছেন। সাম্যবাদী সমাজ চাই কেন ? মার্কস বলছেন, এ সমাজে উৎপাদনের হার বেড়েছে, সম্পত্তির

উপর ব্যক্তিমালিকানার নিরাকরণ হয়েছে শুধু এজন্যে নয়। এ সমাজে শ্রম রূপান্তরিত হয়েছে প্রকাশধর্মী কার্যকলাপে, এবং বন্ধনমুক্ত মানুষ পূর্ণপুরুষ হিসাবে বিকশিত হয়ে উঠছে। কমিউনিজমে যা হবে তা হল—'the reintegration or return of man to himself, transcendence of human self-alienation.'[১৯] কমিউনিস্ট সমাজে দেখা যাবে যে, শ্রম রূপান্তরিত হয়েছে স্বতঃপ্রবৃত্ত কর্মে, ব্যক্তি পূর্ণতার সাধনা করছে; এবং 'only at this stage does self-activity coincide with material life, which corresponds to the development of individuals into *complete individuals.*'[২০] Critique of the Gotha Programme, The Holy Family, Capital—সর্বত্র ঐ একই কথা। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশই মার্কসীয় পরম-ইষ্ট। কমিউনিস্ট সমাজে ব্যক্তিত্বের বাধামুক্ত বিকাশই হবে মুখ্য,—পরম-পুরুষার্থ। এই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনের মধ্য দিয়ে সমষ্টিকল্যাণও সাধিত হবে, তবুও সমষ্টিকল্যাণটি প্রথমটির ফলশ্রুতিমাত্র (we shall have an association in which the *free development* of each is the *precondition* for the free development of all.")[২১]

ছয়

আমার মনে হয় যে সোভিয়েত মার্কসবাদে প্রথম থেকেই নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেকের অভাব ছিল। পিছিয়ে-পড়া, জারশাসিত স্বেচ্ছাচারী সমাজে মার্কসীয় দর্শনের যা নিত্যবস্তু অর্থাৎ ব্যক্তিমানুষের পূর্ণতা লাভের দাবি—তা গেল নেপথ্যে, আর মার্কসীয় দর্শনের সাধনতত্ত্ব (লেনিনভাষ্য অনুযায়ী) হয়ে উঠল পরম-ইষ্ট। সোভিয়েত মার্কসবাদে প্রথমাবধি তাই পার্টি-সংগঠন, রণকৌশল, রাজনীতি, অর্থনীতি অসামান্য গুরুত্ব পেল; Economic and Philosophic Manuscripts-এ মার্কস্ যে অস্তিত্বের সমস্যা তুলেছিলেন, সে মানবিক সমস্যার সমাধান আর হল না। আমি জানি যে জবাবে বলা চলে যে, শ্রেণীসংগ্রামের রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সেনাপতি যদি অর্জুনের মতো ঔচিত্য-অনৌচিত্যের সমস্যায় পীড়িত হন তাহলে যুদ্ধজয়ে দেখা দেবে সংকট। রণক্ষেত্রে যুদ্ধজয়ই একমাত্র ইষ্ট, কেননা ইষ্টবহুত্ববাদের প্রহেলিকায় প্রবেশ করলে নৈষ্কর্ম্যই একমাত্র সিদ্ধি। ক্লৈব্য তাঁকে পেয়ে না বসে এবং হৃদয়দৌর্বল্যে তিনি অভিভূত হয়ে না পড়েন, হয়তো সেজন্যে লেনিন মার্কসের

Economic and Philosophic Manuscripts সম্পর্কে বরাবর মৌনাবলম্বনই করেছেন।

আমার বক্তব্য এই যে লেনিনের পার্টিতত্ত্বের অভিঘাতে মার্কসবাদের মানবিকতা অনেকখানি স্বরূপভ্রষ্ট হয়েছে এবং পার্টিতত্ত্ব যখন তৎকালীনতার দাবিকে ছাপিয়ে সর্বকালীনতার দাবি নিয়ে হাজির হয়েছে, তখনই বোঝা গেছে যে সোভিয়েত মার্কসবাদে শ্রেয়ের চাইতে সাফল্যটাই বড় হয়ে দেখা দেবে।

'শ্রেণীসংগ্রামের নাইট' কার্ল মার্কস শিল্পায়িত দেশের কথা ভেবে বলেছিলেন যে "Every emancipation is a restoration of the *human* world and of *human* relationships to *man* himself." এই মুক্তি আনবে কে? মার্কস বলছেন: 'The emancipation of the working class is the work of the working class itself.' অগ্রসর, শিল্পসমৃদ্ধ দেশে জনসাধারণের সংখ্যাগুরু অংশ শ্রমিকশ্রেণী। ঐতিহাসিক দিক থেকে শ্রমিকশ্রেণী নিজের মুক্তির পথ নিজেই প্রশস্ত করবে এবং শেষপর্যন্ত সমগ্র সমাজের মুক্তির হোতাও হবে শ্রমিকশ্রেণী। শ্রমিকশ্রেণী যখন শাসকশ্রেণী হবে, তখন স্থাপিত হবে সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতান্ত্রিক শাসন, আত্মসচেতন, স্বতন্ত্র শ্রমিকআন্দোলনের ফলে এই 'সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন' রূপ নেবে। "The proletarian movement is the self-conscious, independent movement of the immense majority in the interest of the immense majority."[২২]

জারশাসিত কৃষকের দেশ রাশিয়ায় লেনিন পার্টি-নায়কতার তত্ত্ব প্রতিপন্ন করলেন। লেনিন বললেন: শ্রমিকশ্রেণী নিজের উদ্যোগে পরিত্রাণের পথ আবিষ্কার করতে পারবে না। কেননা শ্রমিকশ্রেণীর দৌড় ট্রেডইউনিয়ন পর্যন্ত। অতএব শ্রমিকশ্রেণীর পরিত্রাণের জন্যে, দুষ্কৃতদের বিনাশের জন্যে 'কমিউনিস্ট পার্টি' চাই। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব না থাকলে শ্রমিকশ্রেণী শুধুই ট্রেডইউনিয়নি কার্যকলাপে আবদ্ধ থাকবে, কোনোদিনই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে না। এই সমাজতান্ত্রিক চেতনা 'বাইরে থেকে' সঞ্চারিত করবে পার্টি। শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবী মহামন্ত্রে দীক্ষা দেওয়াটা কমিউনিস্ট পার্টিরই ঐতিহাসিক দায়িত্ব। সমাজতন্ত্রের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ বিপ্লবী, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র প্রভৃতি কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যমণি হবেন। এরা

হবেন পেশাদার বিপ্লবী, পরে শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ সন্তানেরাও পার্টিতে আসবেন। স্বতঃস্ফূর্ততা ও বুর্জোয়া ভাবধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে এ হেন পার্টি চাই-ই।

"A small compact core, consisting of reliable, experienced and hardened workers, with responsible agents in the principal districts and connected by the rules of strict secrecy with the organisation of revolutionaries.......”[২৩]

এই বিপ্লবীদের সংগঠন অর্থাৎ 'পার্টি' জনসাধারণের নামে আন্দোলন চালাবে, শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবে, সংগ্রামী শিবিরে শ্রমিকসাধারণকে নিয়ে আসবে—"the Party will carry out this universal political agitation, uniting into one inseparable whole the pressure upon the Government *in the name of the whole people,* the revolutionary training of the proletariat—while preserving its political independence....”[২৪]

পার্টি-নায়কতার খুঁটিনাটি আলোচনা লেনিন করেছেন এবং যারাই এই সংখ্যালঘু, বহিরঙ্গ নায়কতাকে সমালোচনা করেছেন, তাদের 'Economists' 'opportunists of Social Democracy' বলে বাতিল করেছেন। এই যে বুদ্ধিজীবী, পেশাদার বিপ্লবীদের সংগঠন যার নাম 'কমিউনিস্ট পার্টি', যার দায়িত্ব ঘুমন্ত শ্রমিকশ্রেণীকে জাগানো, বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়া,—এই পার্টির সাংগঠনিক নীতিটি কি?

কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠিত হবে 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা'র নিয়মে। অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনে উচ্চতর কমিটি নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী হবে, কেন্দ্রের ক্ষমতা ও অধিকার, কেন্দ্রের অভিরুচি অনুযায়ী বিস্তৃত হবে অংশসমূহে। পার্টি-প্রজ্ঞা চুঁইয়ে চুঁইয়ে তলদেশে যাবে, এই হল বিপ্লবী রাজনৈতিক গণতন্ত্রের কথা। তলদেশ থেকে 'প্রজ্ঞা' উপরে উঠবে, এ তো সুবিধাবাদেরই বক্তব্য। অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্যে একটা বিশেষ যুক্তিকাঠামো রচিত হল। বিপ্লব যে সামাজিক অধিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে, যে অধিষ্ঠান হল শ্রমিকশ্রেণী। কিন্তু বিপ্লবের জন্যে চাই অন্য একটি সঞ্চালকশক্তি—সেটি হল কমিউনিস্ট পার্টি। এই সঞ্চালক শক্তির সাহায্যে শ্রমিকশ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে, নতুন বিধান রচনা করে,

সমাজের রূপান্তর ঘটায়। আগেই বলেছি কমিউনিস্ট পার্টিকে লেনিন সংগঠিত করতে চেয়েছেন সামরিক কায়দায়, বলেছেন:

"Bureaucracy *versus* democracy is the same thing as centralism *versus* automatism, it is the organisational principle of revolutionary political democrary as opposed to the organisational principle of the opportunist Social-Democrats. The latter strive to proceed from the bottom upward.......The former strive to proceed from the top downward and advocate an extension of rights and powers of the centre in respect of the parts.”[২৫]

নিরপেক্ষ বিচারে দেখা যাবে যে লেনিনবাদী পার্টিপূজার মধ্যেই ভবিষ্যৎ বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত ছিল। বিশেষ পরিবেশে সে বীজ থেকে পার্টি-নায়কতন্ত্রের বিরাট মহীরূহ বিকশিত হয়েছে সোভিয়েত সমাজে। পার্টি-নায়কতন্ত্রের অন্তর্লীন এ বিপদ বহুপূর্বেই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সাবধানবাণীও উচ্চারণ করেছিলেন অনেকে। তদানীন্তন লেনিনবিরোধী মেনশেভিক ট্রটস্কি সেদিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন:

"The organisation of the Party takes the place of the Party itself; the Central Committee takes the place of the organisation; and finally the dictator takes the place of the Central Committee."

শুধু ট্রটস্কি কেন, জার্মানীর বিপ্লবী নেত্রী রোজা লাক্সেমবুর্গ রুশ-বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়ে যে পুস্তক রচনা করেছিলেন (১৯১৭-১৮) সে পুস্তকে তিনি সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। বিপ্লবোত্তর যুগের উচ্ছ্বাসের কালে সে সাবধানবাণীর শ্রোতা সেদিন দুষ্প্রাপ্য ছিল। রোজা লিখেছেন:

"Without general elections, without complete freedom of the Press and of meeting, without a freedom of discussion, life in every public institution becomes a sham, in which bureaucracy alone remains active.......

Public life gradually disappears......at bottom then, this is

the rule of a clique—a dictatorship it is true, but not the dictatorship of the proletariat, but of handful of politicians, that is in the bourgeois sense...."[২০]

পার্টি-নায়কতন্ত্রের ফলশ্রুতি যে কত বীভৎস হতে পারে বিংশ ও দ্বাবিংশ কংগ্রেসের কার্যবিবরণীই তার প্রমাণ। অবশ্য মনকে চোখ ঠেরে বলা চলে যে, পার্টি-নায়কতন্ত্র স্বরূপত অপাপবিদ্ধ, যা কিছু পাপাচার সবই স্তালিনব্যক্তির কুশাসনের ফলে। কিন্তু পার্টি-নায়কতন্ত্র যদি 'নীতি' হিসাবে গৃহীত হয় এবং গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার 'from the top' নীতিকে যদি শিরোধার্য করতে হয়, তবে অন্তত সেই নীতির উপর দাঁড়িয়ে ব্যক্তি-নায়কতাকে নিন্দা করা চলে না। সমাজনায়কতা শ্রমিকশ্রেণীতে আরোপিত হোক, ঘুমন্ত শ্রমিকশ্রেণীর নায়কতা বিচক্ষণ পেশাদার বিপ্লবীরা গ্রহণ করুন, কমিউনিস্ট পার্টি 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা'-যুক্ত 'from the top' নায়কতা মেনে নিক, তাহলে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা clique-নায়কতা অনিবার্যভাবে দেখা দেবে, বিপ্লবী রোজা এ সত্যটি পঁয়তাল্লিশ বছর আগে তুলে ধরেছিলেন।

সাত

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, পিছিয়ে-পড়া, গণতান্ত্রিক-ঐতিহ্যহীন বিরাট দেশে (ছোট দেশে তো বটেই) পার্টি-নায়কতায় দুঃসাধ্য সাধিত হতে পারে। স্তালিন ব্যক্তিপূজার কালেও সোভিয়েতের মানুষ দুঃসাধ্য সাধন করেছে। স্তালিনকালের পার্টি-নায়কতন্ত্র রাষ্ট্রশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে দেশের ধনসম্পদ জনশিক্ষার আয়োজন প্রভৃতিকে বহুগুণে বাড়িয়ে তুলেছে। পিছিয়ে-পড়া রাশিয়া আজ তাই অন্যতম সু-উন্নত দেশ। পার্টি-নায়কতন্ত্র, বিশেষ করে স্তালিনের লৌহব্যক্তিনায়কতা, শক্তির জোরে, রাশিয়ায় অনেকখানি একপাথুরে ঐক্য সৃষ্টি করেছিল। অশিক্ষা, শোষণ ও অবমাননার হাত থেকে তদাকার মানুষকে একধরনের সাম্যে প্রতিষ্ঠিতও করেছিল। তবুও রুশসমাজে মানুষের আত্ম-আবিষ্কারের প্রশ্নটি থেকেই গেছে, শুধু সাবেকি অর্থে নয়, মার্কসীয় অর্থেও। রাষ্ট্র ও পার্টিশাসনে শৃঙ্খলিত ব্যক্তিপুরুষ আজও এ সমাজে চিন্তায় ও মননে, সৃষ্টিতে ও নিদিধ্যাসনে স্বাধিকারভ্রষ্ট।

সাহিত্যিক ও শিল্পীরা সব সমাজেই সব চাইতে প্রকাশক্ষম অংশ। সোভিয়েত সমাজে যখনই এই অংশ সোভিয়েত রাষ্ট্রাচার ও পার্টি-আচারের

বিরুদ্ধে মৃদু গুঞ্জন তুলেছেন, সোজা সড়ক থেকে নেমে, সৃষ্টিকর্মে নতুন আনন্দরস পরিবেশনের চেষ্টা করেছেন, তখনই ওদেশে পার্টি-নায়কতন্ত্র তাল ঠুকে এগিয়ে এসেছে। পার্টির তূণীর থেকে নির্গত হয়েছে নানা শর। "'পার্টি-সাহিত্য' চাই" লেনিনের এ বক্তব্য তো ছিলই। তাছাড়া দাবি উঠেছে সাহিত্য-শিল্পের 'শ্রেণীবিশ্লেষণ' চাই, 'ইডিওলজিকাল শুদ্ধতা' চাই। আরও দাবি উঠেছে যে, 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'র নীতিকে মেনে নিতে হবে, সাম্যবাদগঠনপ্রয়াসী সোভিয়েত দেশকে বর্ণাঢ্য বৈচিত্র্যে দেখাতে হবে। সাহিত্যিক ও শিল্পীকে 'পজিটিভ হিরো'র টিপিক্যাল চরিত্র সাহিত্য-শিল্পভাত করতে হবে। সৃষ্টির ক্ষেত্রে সুন্দর ও মনোহর সম্পর্কে পার্টিলিখিত সুসমাচারের কথাও সর্বদা মনে রাখতে হবে।

পার্টি-নায়কতন্ত্রের কঠিন বন্ধনে শিল্প-সাহিত্যকে বাঁধবার আগ্রহে ওদেশের পার্টি-পালোয়ানের সর্বদা লেনিনের 'Party organisation and Party literature (1905)-এর বক্তব্যকে সুকৌশলে ব্যবহার করেছেন। ১৯৪৭ সনে শ্রী এ. এ. ঝানভ এ কাজ করেছেন। অধুনা শ্রীইলিচভ ও শ্রীক্রুশ্চভও করছেন। ঐ প্রবন্ধে লেনিন পরিষ্কার করে বলেছেন যে 'পার্টিজান সাহিত্য চাই' অর্থাৎ সাহিত্য শুধু নিঃসঙ্গ ব্যক্তির ব্যাপার নয়, প্রলেটরীয় সাধারণ স্বার্থ থেকে বিচ্যুত করে সাহিত্যকে দেখা চলে না, 'literature must become *part and parcel* of the general proletarian cause.' স্থানকালপাত্রবর্জিত লেনিনের এই বক্তব্য থেকেই পার্টি-নায়কতন্ত্র সাহিত্য-শিল্পে নিজেদের দিঙ্নাগপণার যুক্তি খুঁজে পেয়েছে। লেনিন অসহিষ্ণু দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন, বাদানুবাদ প্রসঙ্গে অনেক একপেশে বক্তব্যও তিনি রেখেছেন একথা আমি মানি। তবু ঐ প্রবন্ধেও লেনিন বলছেন যে সাহিত্য-শিল্প অতিসুকুমার, অতিকোমল ভাববস্তু, ধরাবাঁধা ছাঁচে ঢেলে যাকে সৃষ্টি করা চলে না।

লেনিন বলেছেন :

"It is indisputable that literature is least of all subject to mechanical equation, standardisation to the rule of majority over minority. It is indisputable that literature absolutely requires free rein to personal initiative, individual taste, thought and fantasy."[২১]

১৯০৫ সনে বিপ্লবী শক্তিসমূহকে নতুন করে সংহত করবার মানসে এ বিশেষ যুগে, লেনিন 'পার্টি-সাহিত্য', 'পার্টিজান-সাহিত্য'র দাবি তুলেছিলেন। কিন্তু লেনিন কি এ দাবি করেছিলেন যে ভাবলোকের বিভিন্ন প্রকাশকে মনোলিথিক ঐক্যে বাঁধতে হবে, পার্টি-সাহিত্যের সঙ্গে পার্টি-বহির্ভূত সাহিত্যের 'সহাবস্থান' মেনে নেওয়া হবে না ?

লেনিন বলেছেন :

"First of all we are discussing party literature and its subordination to Party control. Everyone is free to write and say whatever he likes without any restrictions. But every free union (including a Party) is also free to expel members who use the Party's platform to advocate anti-Party views.

I am obliged to accord you in the name of free speech, the full right to shout, lie and write to your heart's content. But you are obliged to grant me, in the name of freedom of association, the right to enter into, or withdraw from, an alliance with people advocating this or that view."[২৮]

এ উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, লেনিন ও পার্টি-সাহিত্যের নামে সকল সৃষ্টিকর্মের উপর নিরংকুশ নায়কতার দাবি রাখেন নি। তিনি বলছেন যে, পার্টিতেও থাকব আবার পার্টির অভ্যন্তরে সমালোচনার স্বাধীনতাও দাবি করব, এ হয় না। স্বাধীনতা দ্বিপাক্ষিক হবে। অ-পার্টি সাহিতিাক নিজস্ব অভিরুচি অনুযায়ী সাহিত্যসৃষ্টি, শিল্পসৃষ্টি করুন। কিন্তু পার্টিরও স্বাধীনতা থাকবে মিত্রলাভের। পার্টিতে থেকে পার্টি-বিরোধিতা কখনই অনুমোদন পাবে না।

বিপ্লবের হোমাগ্নিতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ লেনিনই যে পার্টি-পূজার প্রবর্তন করেছিলেন একথা আমরা আগেই বলেছি। অন্যদিকে লেনিন চেয়েছিলেন শিল্পকে জনজীবনের সঙ্গে মেলাতে। তিনি আশা করেছিলেন যে শিল্প-সাহিত্যের ভোজে জনসাধারণ হবে নিমন্ত্রিত, জনজীবন থেকে উপাদান আহরণ করে সাহিত্যশিল্প আরও লাবণ্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে। বিশেষ করে পিছিয়ে-পড়া, অশিক্ষিত দেশে, সংগ্রামের পটভূমিকায় লেনিন সাহিত্যশিল্পের উপকরণ মূল্যকে অনেকখানি গুরুত্ব দিয়েছেন। ক্লারা জেট্‌কিনকে তাই তিনি বলেছিলেন :

"We must keep the workers and peasants before our eyes. We must learn to reckon and to manage with them, even in the sphere of art and culture।"[২৯]

আপৎকালীন অবস্থায়, শ্রেণীযুদ্ধের পটভূমিতে, 'পার্টিজানশিপ'ও লেনিন দাবি করেছেন, যেমন দ্বিতীয় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় সমরকালীন নেতা কম্যাণ্ডো-আক্রমণের ব্যবস্থা করেছিলেন। মজা হল এই যে রুশদেশের পার্টিনায়কতা শিল্পসাহিত্যের পার্টিজানশিপ নীতিকে 'মূলনীতি' হিসেবে প্রচার করেছেন। লেনিন যে এহেন স্থূল তত্ত্ব গ্রহণ করেন নি, ক্লারা জেটকিনের সঙ্গে কথোপকথনে, ক্রুপসকায়ার স্মৃতিকথায় এবং স্বয়ং লেনিনের টলস্টয়-প্রসঙ্গে আলোচনায় তার ভূরি ভূরি প্রমাণ মেলে। 'পার্টিজানশিপ' যে সাহিত্যোৎকর্ষের একমাত্র লেনিনীয় মাপকাঠি নয়, লেনিনের শিল্পদর্শনে যে theory of reflection-ই সারবস্তু, একথা সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়কতাও জানে। তবুও স্তালিনকাল থেকেই 'পার্টিজানশিপ', 'শ্রেণী বিশ্লেষণ', 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা', এ হেন নানা প্রত্যয়েরই বহুল প্রচার। ক্লারা জেটকিনের লেখা থেকে জানা গেছে যে, লেনিনকালে সোভিয়েত শিল্পসাহিত্য জগতে নানা মতবাদের, নানা সম্প্রদায়ের ছড়াছড়ি ছিল। ক্ষমাসুন্দর চোখে এসব প্রবণতাকে দেখে লেনিন বলেছিলেন, "আমরা বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, সব জিনিস আমরা বুঝি না।" 'লেনিনের স্মৃতিকথা'য় ক্রুপসকায়া লেনিনের সাহিত্যরুচির আলোচনা করে বলছেন যে লেনিন একবার যুব-কমিউন দেখতে গেছেন। নানা আলাপের পর লেনিন জিজ্ঞেস করেছেন একটি কিশোরকে, What do you read? Do you read Pushkin? জবাব এল—'না না আমরা পুশকিন-টুশকিন পড়ি না।' "He was a bourgeois, Mayakovsky for us।" রুশবিপ্লবের নেতা, শ্রেণী সংগ্রামের সেনাপতি লেনিন জবাবে কি বললেন? শ্রীমতী ক্রুপসকায়া লিখছেন, Ilych smiled।" বললেন শুধু: "I think Pushkin is better।"[৩০] পার্টিজান মায়াকোভস্কির চাইতে পুশকিন অনেক সার্থক কবি।

লেনিনের মন্তব্য খুবই ব্যঞ্জনাধর্মী এবং এর তাৎপর্য স্বপ্রকাশ। আসলে লেনিনের 'পার্টিসাহিত্য', 'পার্টিজান্‌শিপ', 'জনীনতা', 'সাহিত্যে শ্রেণী-সংঘাত', এ সব তত্ত্বকেই সোভিয়েত পার্টি-নায়কতন্ত্র ও স্থূল সমাজতাত্ত্বিকেরা বিকৃত করেছে, লেনিনের শিক্ষা থেকে এটুকুই শিখেছে যে সৃষ্টিকর্মে নিরংকুশ

পার্টিনায়কতা বহাল রাখতে হবে, চিত্তবন্ধনমুক্তির কোনো রেশই ভাবের জগতে প্রবেশাধিকার পাবে না। হয়তো এ কারণেই শ্রীযুক্ত ঝানভ কিম্বা সম্প্রতি শ্রীইলিচভ-ক্রুশ্চভ লেনিনের Theory of reflection—প্রতিফলন তত্ত্ব সম্পর্কে মৌনই থেকেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে 'সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজম' নামে যে তত্ত্বের এত হাঁকডাক, সে তত্ত্ব মার্কস কিম্বা লেনিনের নয়। মার্কস-এঙ্গেলস এবং লেনিন 'রিয়ালিজম'কে গ্রহণ করেছিলেন। 'সোশ্যালিস্ট হিউম্যানিজম'-এর কথাও তাঁরা বলেছেন। তবু স্তালিন আমল থেকে রুশদেশে দেখা দেয় 'সোশ্যালিস্ট রিয়ালিজমে'র দৌরাত্ম্য, যার দায়ভাগ সোভিয়েত সাহিত্যজগৎ আজও বহন করে চলেছে।

স্তালিনকাল থেকেই পার্টি-নায়কতা সজোরে ঘোষণা করেছে যে, শিল্প-সাহিত্যের শুধু উপকরণ মূল্যই আছে। সরকারী ও পার্টিনীতির চৌহদ্দির মধ্যেই শুধু শিল্পসাহিত্যের আত্মপ্রতিষ্ঠা, তৎকালীন বাস্তবকে 'সমাজতান্ত্রিক' সুষমায় মণ্ডিত করে তোলাটাই সাহিত্যশিল্প প্রতিভার পরাকাষ্ঠা।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পার্টি-ফরমূলা অনুযায়ী সোভিয়েতদেশে, শেকস-পীয়রের 'শ্রেণী-অবস্থান' ও 'শ্রেণীমানসে'র আলোচনা-সম্বলিত শেকস্‌পীরিয়ানার স্মিরনভী ভাঁড়ামি অতীতে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার লৌহ-বাটখারার আঘাতে ডস্টেইভস্কির সাহিত্যজগৎ থেকে সাময়িক অন্তর্ধানও আমরা লক্ষ্য করেছি। এই বাটখারার ওজনে মেপে, পনেরো বছর আগে, ঝানভ, কবি আখমাটোভাকে সাহিত্যজগৎ থেকে নির্বাসন দেন, বলেন, আখমাটোভার কবিতায় 'বাস্তবতা' নেই, কেননা তাঁর ভাবের রাগিনীটি নির্জনবাসী একলা-কবির চিত্তবাঁশীতেই শুধু বেজেছিল। আমরা একথাও শুনেছি যে সোভিয়েতের সমাজতান্ত্রিক হাটে ওজনদরে যা বিক্রি হয়, এমন কোনো সাহিত্যবস্তুপিণ্ড না থাকায় পাস্তারনেকের সাহিত্য অবিক্রীত পড়ে থাকে। অধুনা শ্রীক্রুশ্চভও বলেছেন যে ইরেনবুর্গও 'বাস্তবতা'র মাপকাঠিতে 'ভালো' সাহিত্যিক নন, কেননা রাজনীতিটা যার ভুল, তার সাহিত্যিক উৎকর্ষ হবে কেমন করে। সোভিয়েত জীবন ও সাম্যবাদ সম্পর্কে ইরেনবুর্গ তেমন 'পার্টিজান' নন! ফলে তাঁর সাহিত্য 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'র নীতির মাপকাঠিতে অপকৃষ্ট। অথচ 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা' একেবারেই অবাঙমনস-গোচর, যার স্বরূপ মাঝে মাঝে পার্টি-নায়কতন্ত্রই শুধু নির্ধারণ করে দেয়।

আট

মার্কসীয় শিল্পমানসের যে উদার বিস্তৃতি তা অনেকখানিই ইউরোপের enlightenment-এর ফল। মার্কসীয় মানসের এই বিস্তৃতি পিছিয়ে-পড়া, স্বেচ্ছাচারী অপ্রবুদ্ধ জারতন্ত্রের দেশে হয়তো প্রত্যাশা করা যেত না। বিশেষ করে বিপ্লবের 'সাধনতত্ত্ব' নিয়ে যতদিন মাতামাতি, ততদিন সাধ্যতত্ত্বটি আশু প্রয়োজনের মাপকাঠিতে কম গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন যুগে, যে যুগে কোনো-না-কোনো ধরনের সমাজতন্ত্র বিশ্বইতিহাসের কর্মসূচীতে স্থান লাভ করেছে, সমাজতন্ত্রের বিপুল বিস্তৃতি ঘটেছে, উপনিবেশবাদের দৌরাত্ম্য ক্রমশঃ বিলীয়মান, যে যুগে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সাধনায় দেশে দেশে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানবিক শক্তি অনেকখানি জাগ্রত, এ হেন যুগে মার্কসীয় জীবনবেদের সাধ্য-বস্তুটি তার দাবি নিয়ে এসে হাজির। এ দাবি যতদিন গৃহীত না হবে, ততদিন শিল্পবিভ্রাটের হাত থেকে সোভিয়েত মানুষের নিস্তার নেই।

সোভিয়েত শিল্প বিভ্রাটের তিনটি কারণ আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।

(ক) সোভিয়েত শিল্পদর্শনে ব্যক্তি মানুষের স্বকীয়তার দাবি অস্বীকৃত। মানুষ যে সামাজিক জীব, সমাজ-আশ্রয়ে মানুষ যে সামাজিক মানবিক হয়ে ওঠে, একথা মার্কস স্বীকার করেছেন। সমাজবিচ্ছিন্ন মানুষ যে শুধুই abstraction, সামাজিক সম্পর্কের তন্তুজালে অবস্থিত মানুষই যে 'ঐতিহাসিক মানুষ' এ মার্কসীয় মতবাদের আলোচনাও আমরা করেছি। সোভিয়েত মার্কসবাদ এ সত্য থেকে আরম্ভ করে সিদ্ধান্ত করেছে যে, তাহলে সমাজই মূলসত্য, ব্যক্তিসত্তা শুধুই আশ্রিত সত্য। তার কথাটা এই যে, সমগ্রের মহাসমুদ্রে ব্যক্তিত্বের শিশিরবিন্দু শুধুই বুদ্বুদের মতো, মায়ায় ঘেরা—অযথার্থ। ফলে ব্যক্তিমানুষের বেলায় জ্ঞানেকর্মে, চৈতন্যের বিস্তারে, সৃষ্টির অভিনবত্বে 'হওয়া'র প্রশ্ন ওঠে না। 'হওয়া'র প্রশ্ন শুধু সমষ্টির, সমাজের। তেমনি সমাজের বেলায়ই শুধু ইষ্টের পরিধি বহুবিস্তৃত। ব্যক্তির বেলায় ইষ্টের মাপ-কাঠি হল—সমাজের সঙ্গে একাত্মতা, সমাজহিত (পার্টি-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী); সমাজ প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে অপ্রয়োজনের জগতে, ভাবলোকের রাজ্যে বিহার করা নেহাৎই অহংমমাভিমানের কথা। মার্কস বলেছিলেন, ব্যক্তিমানুষ কীটপতঙ্গ থেকে, অন্যান্য মনুষ্যেতর প্রাণী থেকে গুণগতভাবে পৃথক। মৌমাছিও কর্মী, মানুষও কর্মী। মৌমাছি সমগ্রের প্রয়োজনে কাজ করে,

সে কাজের মধ্য দিয়ে প্রজাতি (species)-কে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু মানুষের কাজ শুধুই প্রয়োজনের শিকলে বাঁধা নয়। মানুষের কাজের, বিশেষতঃ ভাবকর্মের—আছে সর্বকালীন বিস্তার (man creates universally)। অর্থাৎ প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে শিল্পে সাহিত্যে মানুষ সুন্দরের সাধনা করে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, সত্যের মুখোমুখি হবার চেষ্টা করে, ব্যক্তিজীবনে ও সমাজ-জীবনে শ্রেয়কে পাবার জন্যে সচেষ্ট হয়। সোভিয়েত মার্কসবাদে এসব মার্কসীয় বক্তব্যই অস্বীকৃত। মার্চ মাসের বক্তৃতায় শ্রীক্রুশ্চভ তাই পরিষ্কারভাবে সমকালীন সোভিয়েত মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন যে সমাজতান্ত্রিক সমাজে সমাজপ্রয়োজনে কাজ করা ছাড়া মানুষের আর তো কোনো 'ইষ্ট' হতে পারে না। এ সমাজে—

"Everyone, like a bee in a hive must make his contribution to the material and spiritual wealth of society. There may be people who would say that they disagree with this. To this I would reply, we live in an organised socialist society where the interests of the individuals are in accord with the interests of Society !"[৩১]

ফলে কি অর্থনীতির ক্ষেত্রে কি সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রে ব্যক্তিমানুষকে সমষ্টির স্বার্থ অনুযায়ী চলতে হবে, এ চলাতেই তার সার্থকতা, অন্য কোনো পথ আর নেই।

(খ) সোভিয়েত মার্কসবাদে 'পার্টি-নায়কতা' ও 'রাষ্ট্রনায়কতা'র তত্ত্ব শিল্পদর্শনে জগদ্দল পাষাণভারের মতো বরাবরই অবস্থান করেছে। বলা হয়েছে ব্যক্তি ও সমাজস্বার্থের সমীকরণ করে সমাজকে সঠিক পথে চালনা করবার ইতিহাসসম্মত (শ্রীক্রুশ্চভ মার্চ মাসে বলেছেন) দায়িত্ব পার্টির! ফলে শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে সর্বত্র পার্টি-নায়কতার অধিকার নিরঙ্কুশ। সত্য শিব ও সুন্দরের রূপ ও অভিব্যক্তি শুধু পার্টি-বোধেই স্বচ্ছভাবে ধরা পড়ে এবং পার্টি-নায়কতা মেনে সাহিত্যিক ও শিল্পী সমাজের সঙ্গে সাধারণীকৃত হয়ে সার্থকতার আস্বাদ লাভ করেন। সাহিত্যিক ও শিল্পী তাই পার্টি-মাহাত্ম্য মেনে নিয়ে পার্টি-প্রজ্ঞার অনুধ্যান করবেন। পার্টি-প্রতিপাদিত শিল্পতত্ত্ব মেনে তদনুযায়ী কাজ করে তবেই সার্থক শিল্পী হয়ে উঠবেন। আমরা আগেই দেখেছি মার্কস শিল্পসাহিত্যের 'চরম মূল্য' স্বীকার করেছেন। সোভিয়েত

মার্কসবাদে সাহিত্যশিল্পের 'উপকরণ মূল্য' ছাড়া অন্য কোনোও মূল্য স্বীকৃত নয়। ফলে পার্টিয়তা, জনীনতা, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা, শ্রেণীস্বার্থ এমনিতরো নানা বহিরঙ্গ দাবির কাছে ঐ দেশের শিল্পসাহিত্য আজও আত্মসমর্পিত।

(গ) মার্কস যা কিছু 'মানবিক' তার প্রতিই অনুরক্ত ছিলেন। এবং মার্কস একথা বিশেষভাবে জানতেন যে চিত্তলোকের সম্পদকে প্রত্যয়ের বাঁধনে বন্দী করা ভুল। ইস্কাইলাস পিছিয়ে পড়া দাস-সমাজের কবি, দান্তের কাব্য-কৃতিতে মধ্যযুগের মানস বিধৃত, কোন্ সাহিত্যকৃতিতে কতটা পার্টিজ্ঞান ভাববস্তু আছে, এবং বাস্তবতার বস্তুপিণ্ডের ওজনই বা সাহিত্যে কতখানি, এ হেন আলোচনা মার্কসের শিল্পদর্শনে অলভ্য। ১৮৫৯ সনে ইস্‌থেটিক্‌সের উপর মার্কস যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন সে প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে শিল্পে সাহিত্যে রূপ (matter) থেকে অরূপে যাওয়াটাই লক্ষ্য, এই লক্ষ্যে পৌছবার কোনো একটি পথ নেই, কোনোদিন আবিষ্কৃত হবে কিনা তাও বলা শক্ত। অন্যদিকে সোভিয়েত মনোলিথিক সমাজে পার্টি-নায়কতার দাবি এই যে, শিল্পে, সাহিত্যে "এক মত, এক পথ, এক লক্ষ্য" চাই। মতবৈচিত্র্য, পথবৈচিত্র্য, সাধনাবৈচিত্র্য এ সমাজে আজও স্বীকৃত নয়। ফলে মানবাত্মার যে অপরিমেয় ঐশ্বর্যের কথা মার্কস বলেছিলেন এবং যে ঐশ্বর্য থেকেই শিল্পসাহিত্যের বীণায় সুরের ঝঙ্কার ওঠে, সেই ঐশ্বর্য আজও সোভিয়েত সমাজে অবজ্ঞাত।

আগেই বলেছি মার্কস ভেবেছিলেন, ভবিষ্যৎ সাম্যবাদী সমাজ হবে নিপীড়ন-হীন, প্রবুদ্ধ মানুষের স্বতঃপ্রণোদিত সহযোগিতায় গড়ে ওঠা অভিনব সমাজ। শোষণমুক্ত মানুষ, শ্রমবিভাগকে অতিক্রম করে সৃষ্টি করেছে শিল্পীর আনন্দের জগৎ। সমষ্টিতান্ত্রিকতা ও শ্রমবিভাগের যূপকাষ্ঠে এ সমাজ বলি প্রদত্ত নয়, ব্যক্তিমানুষ এ সমাজে পূর্ণতার সাধনায় নিযুক্ত। কবি মার্কসের স্বপ্নের কথা অধুনা সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়কেরা 'বোকা ফিলিষ্টিনের' কথা হিসেবে বাতিল করেছেন। ভি. এম. ক্রিয়ুকভ ভবিষ্যৎ সাম্যবাদী সমাজের যে চিত্র অঙ্কণ করেছেন, সেই চিত্রকে অনুমোদন করে 'Kommunist' পত্রিকা বলছেন :

"An unintelligent person and philistine might form his own picture of communism approximately as follows. You rise in the morning and ask yourself, where shall I go to work to-day. Shall I be chief engineer at the factory or go and head the fishing brigade ? Or shall I run down to Moscow and

hold an urgent meeting of the presidium of the Academy of Science ?" 'Kommunist' মন্তব্য করছেন "It will not be so।"[৩২]

এই বোকা ফিলিষ্টিনটি—যিনি মার্কস ছাড়া আর কেউ নন, আরও 'বোকামি' করে ভেবেছিলেন যে ভবিষ্যৎ সমাজে—"we shall have an association in which the *free development of each* is the pre-condition for the free development of all'। বর্তমান সোভিয়েত নায়কতন্ত্র বলছেন—'তা হবার নয়।'

"Not only socialist society, but society in general, any social system, cannot exist without the principle of *organisation* and *direction*।[৩৩]

ফলে বোকা ফিলিষ্টিনটি যখন বলেন মানুষ কীটপতঙ্গ নয়, মৌমাছি নয়, বেত্রশাসিত শুধু জন্তুও নয়, 'man also creates according to the laws of beauty', তখন কমিউনিস্ট পার্টির প্রাজ্ঞ নেতারা বলেন যে, "In questions of creative art, the Central Committee will demand from everybody—from the most honoured and renowned worker of literature and art as well from the young budding artist—*unswerving abidance of the Party line*।"[৩৪] সোভিয়েট শিল্পবিভ্রাটের মূলকারণ এখানে।

গ্রন্থপঞ্জী

১। Engels—L. Feuerbach

২। Frederick Engels-Letter to H. Starkenburg, Jan. 25, 1894

৩। Karl Marx—A contribution to the Critique of Political Economy, pp. 301-12.

৪। F. Engels—reproduced in 'Literature and Art' by Marx & Engels Current Book Distributors, Sydney—pp. 20.

৫। Marx & Engels—The German Ideology—pp. 33-34 (Modern Publishers)

৬। Do. Do.

৭। Marx—quoted from M. E. G. A. by Tucker in 'Philosophy & Myth in Karl Marx—p. 159.

৮। Marx—Economic & Philosophic Manuscripts—1844, Moscow 1961.

৯। do. do.

১০। Marx & Engels—The German Ideology.

১১। Marx—Capital, pp. 198 (The Modern Library) Tr. by S. & E. Aveling.

১২। Quoted from Marx—'Literature & Art' pp. 16 (Sydney).

১৩। 'Literature & Art' (Sydney).

১৪। do.

১৫। do.

১৬। do.

১৭। Marx Engles—The German Ideology.

১৮। Paul Lafargue on 'Marx & Literature'.

১৯। Marx-Engels—M. E. G. A, III, pp. 113—114.

২০। Marx-Engels—The German Ideology.

২১। Marx-Engels—The Communist Manifesto.

২২। do. do.

২৩। Lenin—What is to be done : Selected Works, I pp. 230 (Moscow)

২৪। Lenin— do. pp. 211 do,

২৫। Lenin—One step forward, two steps back—pp. 334.

২৬। Rosa Luxemburg—On Russian Revolution, quoted in 'Revisionism'. by Leopold Labedz—p. 63.

২৭। Lenin—Party Organisation & Party Literature—Moscow.

২৮। Lenin— do.

২৯। Memories of Lenin—N. Krupskaya : Lawrence & Wishart.

৩০। do.

৩১। N. S. Khruschov's Speech on March 8, 1963 : Moscow News No. 11, '63.

৩২। 'Kommunist'—No. 12. August 1960 (Moscow).

৩৩। N. S. Khruschov's Speech—March 8. 1963.

৩৪। do. do.

গোলাপ হয়ে উঠবে

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

শান্তনু মুখ তুলে তাকাল। ম্লান মুখে ইঙ্গিত করল, চলে আসুন।

দুটো চায়ের কথা বলে সুব্রত শান্তনুর সামনে গিয়ে বসল। অদ্ভুত এই দোকানটা। একদিকের দেওয়ালে অবাঞ্ছিত অতিথিদের জন্য একটা বোর্ড—মদ্যপান নিষেধ—ইংরিজিতে এবং বাংলায়। বোধহয় গত যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন অন্যদিকে রেস্তোরাঁর দেওয়ালে একটা মস্ত ছবি—লেনিনের আবেদন, শ্রমিক শ্রেণীর কাছে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল কর। মানব এই ছবিটার মতো করে নৈহাটী স্টেশনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে দিতে বোকার মতো গ্রেফতার হয়েছিল। ছবিটা এখনো মানবের খুব প্রিয়। মানব কয়েকটি নতুন ছেলের কাছে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব ব্যাপারটা কী বোঝাচ্ছে। পার্টির বর্তমান কর্মপন্থা কী হওয়া উচিৎ তা নিয়ে জল্পনা করছে। কায়েমী স্বার্থ আর ভ্যাসিলেটিং মিডল ক্লাশ কথাটা মানবের আলোচনায় ঘুরে ঘুরে আসছে। সুব্রতর দিকে তাকিয়ে মানব চোখ ফিরিয়ে নিল। মানব বলল—সেই কারণেই বলা হয় যে বসে বসে একখানা কেতাব পড়ার চেয়েও একটা মুর্গি কাটা শক্ত ব্যাপার। আমাদের ইন্টেলিজেন্সিয়া বুর্জোয়া মনোবৃত্তির লেজুড় হয়ে থাকলে···সুব্রত শান্তনুকে বলল—গিয়েছিলাম। নিচু গলায় শান্তনু বলল—ও?

—গিয়েছিল।

—কিছু বলল?

—রিকসায় ফিরতে ফিরতে কাঁদছিল।

চুপ করে শান্তনু টেবিলে সল্ট-সেকারটা নাড়াচাড়া করতে লাগল। বলল—এখানে এখনি ওরা আপনার স্যাক্রিফাইসের অভাবের কথা আলোচনা করছিল। ওদের ধারণা আপনি রুচিকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন। রুচি কাঁদছিল কেন?

—না কেঁদে আর বোধহয় পারল না।

—এগুলো এত বেশি সাময়িক—মুখ নিচু করে একটু হাসল শান্তনু।

—তুমি এত অবিশ্বাস করছ কেন সব কিছুকে?

শান্তনু যেন অনেক দূরে। মানবের বুকনিতে ক্লান্তি। ক্যাশবাক্সের সামনে ভিড় নেই। গরম চিংড়ির কাটলেটের গন্ধে হাওয়া লাগল। দরজার কাচের শার্সিতে বৃষ্টির আঁকিবুঁকি। না এলেই ভালো হত। একা থাকতেই ভালো লাগত। পাখাটা ঘুরছে। দুটো ডেভিল, দুটো চা। দুটো টোস্ট—চিনি নয়। ফাউল কাটলেট একটা। বাইরে রাস্তাটা ফাঁকা। ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়াগুলো ভিজছে। রিক্সা ফেলে রেখে, রিক্সাওয়ালারা স্টেশন-দালানের নিচে চলে গেছে। সিনেমার শো ভাঙতে দেরি আছে। আপে ডাউনে গাড়ি নেই এখন। রাস্তায় ভিড় নেই। কী একটা কথায় এখানে সবাই হাসতে লাগল। সুব্রতর মনে হল শান্তনুর যেন অনেক বয়স হয়ে গেছে। ধূসর চল্লিশের সেই ওপারে চলে গেছে সে। এমনি একদিন সেও এই দোকানে এসে বসেছিল। ফার্স্ট ইয়ার না সেকেণ্ড ইয়ারে—হাঁ করে দাদাদের কাছ থেকে ডায়ালেকটিক্‌সের পাঠ নিত। কে একজন বলল শহিদপুর কলোনিতে দুটো সাপেকাটা কেস হয়েছে। কে বলল, বোরুড়ির বিলে জল বাড়ছে। কলোনিগুলোয় তাহলে বন্যা হবে। বৃষ্টি ঝেঁপে আসছে। ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ। একবার মেঘ ডাকল। রুচি এতক্ষণে বাড়ি পৌঁছে গেছে। কী ভাবছে, কী ভাবছে সে! শান্তনু কেটে দিল ভাবনাটা—বিকেলের দিকে জর হয় রোজ, বোধহয় সেই জন্যেই ভালো লাগে না কিছু।

—ওখানে মাস্টারিটা হল তোমার?

—হ্যাঁ আজই তো জয়েন করলাম। বাড়ি যাইনি। তারপর থেকে এখানেই বসে আছ। শুকনো মুখে দুটো মৌরি ধনেরচাল ছুঁড়ে দিল ও। সুব্রত চায়ের পেয়ালা খালি করে টেবিলে রাখল।

—আগে আমারও এক সময় ছিল যখন এখানে বসে বসে গুলতুনি করতে ভালো লাগতো। এখন আর লাগে না। এত দুর্বোধ্য লাগে সব—

—আমারও যে লাগে ঠিক তা নয়, তবে যাই কোথায়। মাঝে বসতাম গিয়ে ইউনিয়ন অফিসে। এমন তো সেটায় সোস্যালিস্টরা বসে।

—ইউনিয়নটা যে গেল মানবরা কী বলে? সুব্রতর গলায় একটু ব্যঙ্গ রয়েছে যেন।

—মানব তো এখন আন্তর্জাতিক শান্তি ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে মাথা ঘামায় না।

—ছ-মাস আগে হলে বলতো হয়ত মেরে কেড়ে নাও।

—ভাবছি আর একবার পরীক্ষা দেব। ইউনিয়ন ফিউনিয়ন এখন থাক।

—সেটা মন্দ নয়, যদি মন থেকে সাড়া পাও তবেই কোরো।

—হ্যাঃ কী হবে ঘষটাঘষটি করে। জানেন সুব্রতদা এই রেস্তোরাঁটা বোধহয় আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে।

—কী করে জানলে?

—আর. এস. পির এক ভদ্রলোক নেবেন বোধহয়। অনেক ধার জমে গেছে বিশুদার। ও আর পেরে উঠছে না। পার্টি বে-আইনি হবার মুখে শ তিনেক টাকায় ঘা খেয়েছে বেচারা। দুবার দোকানটা খানাতল্লাস হয়েছে। বাইরের লোক দোকানে আসাই বন্ধ করেছে। কমরেডরা আসে আর টিকটিকিরা আসে—

—দোকানটা আমাদের হাতছাড়া হলে ক্ষতি হবে খুব। তিরিশ সাল থেকে এটা আমাদেরই হাতে। জানো, দাদাদের কাছে শুনেছি হালিশহর থেকে বিপিন গাঙ্গুলি নৈহাটীর নির্মলদা বোমার যুগের রুই কাতলারা সব এখানে জমতেন।

—ভারি স্ট্র্যাটেজিক পজিশন দোকানটার।

—ঠিকই, আমার মনে আছে থার্টি এইটের স্বাধীনতা দিবস। কী কারণে যেন হাণ্ডেড ফর্টিফোর। বাজারের পেছন দিয়ে দোকানের ভেতরে ঢুকে সটান আমরা রাস্তায় পড়লাম পুলিশ ফাঁকি দিয়ে। কত আর বয়স তখন, ক্লাস এইটের ছেলে। এখানকার রাজনৈতিক ইতিহাস লেখা হলে এই রেস্তোরাঁটা একটা চ্যাপটার শাস্তনু।

—এরা শুধু শুধু চলে যেতে দিচ্ছে দোকানটাকে?

—মানব কী বলে?

—ও তো কখনো ছোট কথা বলে না। বলছে ওসব কোটারির দিন চলে গেছে। এখন মাস মুভমেণ্টের কাল, এসব আর ফ্যাক্টর নয়।

সুব্রত অন্যমনস্ক হয়ে শুনছিল অনেক দূরের কলরব। দুটো বাল্বলে পোকা খালি পেয়ালায় পড়ে গিয়ে ডানা ফরফর করছে। সারা ঘরে কোথা থেকে এসেছে একরাশ পোকা। যেন অনেক দূরের সম্মিলিত কলরব। থার্টি এইটের দিনগুলো যেন ভেসে আসছে। কত আশা, কত উদ্দীপনা। স্টেশন বিল্ডিঙে পতাকা তোলা নিয়ে কত হাঙ্গামা। হাই তুলল শান্তনু। দেখাদেখি সুব্রতও একটা হাই তুলল। রেস্তোরাঁটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। মানব আর ছেলে কটি চলে গেছে। বিশুদা আস্তে আস্তে উঠে এলেন সুব্রতর কাছে। পান চিবোতে চিবোতে বিশুদা বলল—হয়, 'ড্রিঙ্কিং অফ লিকার প্রোহিবিটেড' এই প্ল্যাকার্ড সরাতে হবে, নয় দোকান চলে যাবে। সুব্রত চুপ করে বিশুদার দিকে তাকিয়ে রইল।—অথচ সেটা করি কী করে, বিশেষ এই দোকানে। এখানে এতদিন গান্ধিজী আর খদ্দর ছাড়া আর কিছু উচ্চারণ করা চলত না। যারা দোকানে এসে বসতো তারা জানতো একটা স্বদেশী করছে—এখানে যারা চা খেতো তাদের নাম পুলিশের খাতায় থাকত। আর এখন পুলিশকে ঘুষ দিতে হবে বেআইনী বার খুলেছি বলে। তুমি বিশ্বাস করবে না সুব্রত, কত খদ্দের যে তাড়িয়েছি তার হিসেব নেই। এসেছে রাত দশটার সময় একটা ছুঁড়ি যোগাড় করে, প্ল্যাকার্ডটার দিকে তাকিয়ে চলে গেছে। এভাবে দোকান চলবে না। তুলে দিই বরঞ্চ। সংসার চালাতে হবে তো। বৌদির বোধহয় আবার ছেলে পুলে হবে। দিদি, জামাইবাবু মারা যাবার পর মেয়ে দুটোকে নিয়ে এখানে এসে উঠেছে। বাসা ভাড়া বেড়েছে, জিনিসপত্রের দাম···

রেস্তোরাঁর পুরনো কারিগর সাধু চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মধুদার কথা শুনছিল। মাঝখান থেকে সে কথার খেই ধরল। এই দোকানেই সে চুল পাকাতে চলল। সবাইকে সে নাবালক দেখেছে।

—দোকানটা যখন বাড়ানোর সময় তখন আপনারা দোকানটার মুখের দিকে তাকালেন না। চপকাটলেটের দোকানে কি লোকে ভুজ্যি উচ্ছুগ্গু করতে আসে, না গঙ্গাজল খেতে আসে। লড়াইয়ের সময় মিলিটারিরা মদ খেলে আপনি দোকান থেকে বার করে দিতেন। সেই ফাঁকে কতো দোকান যে এখানে জমে উঠল তার কথা নেই। জমবে না কেন, এসব মালঝালের ব্যাপার। মালের মুখে, আপনি দুদিনের বাসি জিনিস চালিয়ে গেলেও ধরা মুশকিল—ওসব জিনিসের সুবিধে কত। ব্যবসায় লোকসান নেই। আর

টানে কিসে মাল পড়লে তবে তো টানবে। আপনাদের শান্তনুবাবু বেলা চারটে থেকে চেয়ার জোড়া করে বসে থাকলেন—এককাপ চায়ের অর্ডার দিয়েছেন—এতে চলে না। মুখময় বসন্তের দাগ। বিশুদার মুখখানায় যেন অনেক কষ্টের চিহ্ন আঁকা রয়েছে। শুনতে শুনতে বিশুদা সাধুকে বলল—তুই থাম। কথাটা মিইয়ে গেল। শেষ খরিদ্দার চলে গেছে। রাত বাড়ছে।

দোকান ফাঁকা। বাইরে বৃষ্টির ঝাপট। এলোমেলো হাওয়া। আলোর চারপাশে পোকা। শূন্য চেয়ার। বোঝাই ছাইদানি। এঁটো কাপ-ডিশ। পাখাটা থেমে গেছে। হাওয়া গোঁ গোঁ করছে। ছুটো দুঃসাহসী ছুঁচো কিচেনের দিক থেকে কুঁই কুঁই করে এগিয়ে এল। তারপর আবার ফিরে গেল। স্টেশন বারান্দায় উদ্বাস্তু পরিবার কাঁথা আর চট মুড়ি দিয়েছে। সুব্রত বিশুদাকে কোনো পরামর্শ দিল না। সাধুর কথাতেও কোনো মন্তব্য করল না। দোকানের বাচ্ছা ছেলেটা টুলে বসে ঢুলছে। নাল পড়ছে মুখ দিয়ে। জোরে বিদ্যুৎ চমকালো একবার। বৃষ্টি পড়ছে। টিনের চালে, পিচের রাস্তায়।—কোথায় ছাদের জমা জল ভাঙা পাইপ দিয়ে নর্দমায় পড়ছে। জানলা-বন্ধ বাস চলে গেল। সুব্রতর যেন কোনো কাজ নেই। কোথাও যাবার নেই। বাড়ি ফিরতে হবে না। যেন এই বৃষ্টি তাকে অনন্তকালের জন্য ছুটি দিয়েছে সময় থেকে, জগৎ থেকে। বৃষ্টির ছাট রাস্তায় পড়ে হাওয়ার ঝাপটে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া ওর হাতের ওপর এসে পড়ল। হাওয়ায় স্নিগ্ধতা। ঝকঝকে দরজার কাচের ওপর বৃষ্টির জলের আঁকিবুকি চোখের জলে ভেসে-যাওয়া মুখের মতো সুন্দর। চোখের জলেই মানুষকে এখন একালে সুন্দর দেখায়। হাসিতে মানুষ যেন কৃত্রিম। হাসি যেন ফেনা ঢেউয়ের ওপর তলা—কান্না যেন সমুদ্রের গভীরতা।

ছুঁচো ছুটো নিঃসঙ্কোচে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বৃষ্টি বাড়ছে। হাওয়া বাড়ছে।

অনেকক্ষণ বাদে সুব্রতর খেয়াল হল বাস আসছে না আধঘণ্টার ওপর। সাধু বলল বাস তো বোধ করি আজ আর আসবে না। বলছিল রাস্তায় গাছ পড়েছে। সুব্রত বলল—রিকসা ভাড়া যাবে? সাধু বলল, এই দুর্যোগে যাবে কি? খোঁজ নিয়ে এল সাধু। না—যাবে না। স্টেশন রোডের দোকানপাট বন্ধ হতে শুরু করল।

রাস্তা নির্জন। রাত গড়িয়ে চলেছে। বসেই থাকল সুব্রত। রাত এগারোটার ঘর পেরিয়ে গেল। বিশুদা বলল—কী করবে সুব্রত, চলো না হয় আমার ওখানেই। ও ইতস্তত করতে লাগল। বারোটায় এ-দোকান বন্ধ হবে। দেখা যাক। স্টেশন বারান্দায় উদ্বাস্তু পরিবার চটমুড়িটা খুলল। আবার বন্ধ করল। ফাঁকা ঘোষপাড়া রোড পরিত্যক্ত পথের মতো পড়ে পড়ে ভিজছে। সব পুরনো পায়ের দাগ আজ যেন মুছে ফেলবে এই পথ। স্বামীটি চট-কাঁথা সরিয়ে রেখে উঠে বসল। হাই তুলল। ওদিকে অন্ধকারে কোথায় গেল। বৌটি উঠল। বুকের আঁচল সামলে উঠে গেল স্বামীটির পিছু পিছু। একটা কুকুর তীক্ষ্ণ স্বরে কেঁদে উঠল একবার। বড় ড্রেনে জল উপছিয়ে গেছে। রাস্তায় এবার জল জমছে। এরমধ্যে বার দুয়েক ইলেকট্রিক ফেল করল। আবার জ্বলল। হাওয়ার ঝাপটে দেওয়াল থেকে ক্যালেণ্ডারটা ডানাভাঙা পাখির মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। সারা ঘরের মেঝেয় ক্যালেণ্ডারের পাতার খসখস শব্দ। আবার একবার আলো নিবল। অন্ধকারে ঝড়ের ডাক। জলের নৃশংস শব্দ। আলো জ্বলল। বৌটি ফিরে এল। হাতে করে খোঁপা বাঁধছে। একটু পরে স্বামীটি। দূরে কোথায় বন্দুকের শব্দ হল। বিশুদা বলল—গেল বোধহয় একটা। ওয়াগন ব্রেকার্সদের কেউ। ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ডসদের ফায়ারিংএর শব্দ। চলেই যাওয়া যাক বিশুদার বাড়ি। ঘুম আসছে যেন। বৃষ্টির অবিরল শব্দ জড়িয়ে যাচ্ছে চেতনায়। আবার সব অন্ধকার হয়ে গেল। এবারে বোধহয় পাকাপাকি ব্রেকডাউন। অন্ধকারে বোঝা গেল ঘরে একটা জোনাকি এসেছে। তার মিটমিটে আলো আর লেনিনের ছবিটা—কারা এল যেন। কথা বলল উঁচু গলায়—বিশুদা দোকানে কেউ আছে নাকি? একটা সাইকেল, পিছু পিছু আরো কটা। মানবের গলা। চটকানা ভেঙে গেল। ওয়াটারপ্রুফ পরা, আপাদমস্তক জলসপসপে মানব আর তিনটি ছেলে। সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে এল। বিশুদা বলল—সুব্রত আছে। মানব চুপ করে গেল। তারপর বলল যেন জনান্তিকে—

শহিদপুর কলোনিতে জল ঢুকেছে। সব ঘরে একহাত করে জল। সবাই ফ্যামিলি নিয়ে ঘর ছেড়ে বড় রাস্তায় চলে আসতে চাইছে।

আর একজন বলল—তারপর ছুটো স্নেকবাইট হয়ে যাওয়াতে আর কেউ জলের মধ্যে থাকতে চাইছে না। কাছে একটা স্কুল রয়েছে অথচ তারা জায়গা দেবে না। লোকগুলো রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে।

সুব্রত যেন হাতে একটা কাজ পেল। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল—চল। সাইকেল চলবে?

ওরা বলল—না, সাইকেল চলবে না। সাইকেল সব এখানে থাকুক। এক এক করে সাইকেলগুলো ওরা দোকানে তুলে দিল। তারপর অন্ধকার রাস্তায় নামল সবাই। রাস্তায় বেশ জল জমেছে তখন। বৃষ্টিও পড়ছে। তবে বৃষ্টির বেগ কমে এসেছে। পায়ের গোছ অবধি জল। সুব্রত ওয়াটার-প্রুফটা গায়ে দিল। যেতেও হবে অনেকটা। শহর ছেড়ে পূবে। জলকাদা অন্ধকার পেরিয়ে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল—মেঘ ডাকতে লাগল।

মানব বলল—আমরাই আগে খবর পেয়েছি। কংগ্রেস কি সোস্থালিস্টরা কেউ ওখানে পৌছবার আগেই আমাদের পৌছনো দরকার। পজিটিবলি।

—আমাদের প্রোগ্রামটা কী? সুব্রত জিজ্ঞাসা করল।

—স্কুলবাড়িটা খোলাতে হবে। কিন্তু তার আগে স্ট্র্যাণ্ডেড লোকগুলোর কাছে পৌছতে হবে। অন্ধকারে নিঃশব্দে সকলে পথ হাঁটতে লাগল। খানিকক্ষণ বাদে ওরা রেলরাস্তার ওধারে গিয়ে পড়ল। রাস্তায় কাঁচামাটির কাদা। দু-ধারে জল। ঝড়ে গাছ ভেঙেছে। বেশির ভাগই সজিনা গাছ। অন্ধকারে লক্ষ লক্ষ জোনাকি জলছে। হাওয়ার ঝাপটে ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এক হাঁটু কাদা। কখনো কখনো এক-কোমর জল। বড় বড় দুটো টর্চ জ্বালিয়ে ওরা এগিয়ে চলল। সুখদেও বলে ছেলেটি অবাঙালি। সে গেঞ্জি গায়ে ভিজতে ভিজতেই চলেছে। ওর হাতে চেঁচিয়ে কথা বলার জন্য টিনের চোঙা। আরো খানিকদূর গেলে কলোনির মাঝখানে পৌছনো যাবে এমন একটা রাস্তায় গিয়ে উঠবে ওরা। আবার বৃষ্টি এল। জল—জল চারিদিকে জল। রাস্তাটা ভেসে গেছে। বিদ্যুৎ চমকে দূরে দেখা যাচ্ছে, কলোনির ছেঁচাবেড়া চালাঘরগুলো জলের মধ্যে নিথর কবরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। টর্চ ফেলে ফেলে মাঝে মাঝে দেখতে লাগল এরা। জলে ভেসে এসেছে যত রাজ্যের আগাছা। মরা বেড়াল। নিশ্চয় কলোনির খোলা পায়খানাগুলোর যত নোংরা চারিদিকে ছড়িয়েছে। দুর্গন্ধে গা ঘুলিয়ে ওঠে। অন্তত দুশো হাত জল ঠেললে তবে যাওয়া যাবে সামনের কখানা চালার কাছে। মানব বলল টর্চ জ্বালিয়ে নাড়াও, সুখদেওর চোঙা ফোঁকো। সুখদেও কমিউনিস্ট পার্টির নামে নাড়া দিল। লাল ঝাণ্ডার নামে। দূরে একটা ব্রহ্মডাঙার মতো উঁচু জায়গা—একটা অশথ গাছ। অশথ গাছ হা হা

করছে ঝোড়ো হাওয়ায়। বৃষ্টির আওয়াজ। জলের কল কল শব্দ।—দরাজ গলায় সুখদেও চোঙা মুখে হাঁক দিল, কোথাও সাড়া নেই। মানুষগুলো কি চলে গেল নাকি। জল সোঁ সোঁ গর্জন করে চলেছে। জল গর্জন করছে যেন অন্ধকারই ফুঁসছে। মেঘে-মেঘে বোবা আকাশ কখনো কখনো গুম গুম করছে। কে একটা লোক রাস্তার ধারে কালিমাখা লণ্ঠন জ্বালিয়ে উবু হয়ে বসে। ঘোলাটে চোখ। মাথা তুলে তাকাল সে। মাছের ঘুনি পেতেছে। 'বোরুডির বিল ভেসে গেছে বাবু।' 'জানো কলোনির লোকেরা গেল কোথায়?' 'হুই ব্রহ্মডাঙার পেছনে দেখেন গিয়া।' 'ইদিক থেকে আবডাল পড়ে গেছে।' সোজা রাস্তায় যাওয়া যাবে না? মানব বলল। ঘুনিওয়ালা বলল—একখানা গেরাম ঘুরতে হবে আপনাদের আজ্ঞে। ওরা জিজ্ঞাসা করল—মাঝখানটায় জল কতো হবে বুড়ো কত্তা?—'কোমর-সই জল হবে। জলের জন্য কিছু না, লতায় কাটল যে দুটোকে।' 'তোমার ঘর কোথায়?' 'হোথা'। কালিমাখা লণ্ঠন ধরে ঘুনি পাততে লাগল সে। মানবেরা ঘুরতে ঘুরতে এগুতে লাগল। পা কাটল সুখলালের। মাটি টিপে দিল। মানব অভয় দিল। কুছ ডর নেই, জান দেনেকো লিয়ে তৈয়ার হায় হামলোগ। টর্চ একটা ফিউজ হয়ে গেল। গ্রামের কুকুর ডাকতে ডাকতে পালাল। আবার ওরা কলোনির মুখোমুখি হল। টর্চটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল জল—জল—জল। অন্ধকারের উন্মত্ত মাথানাড়ার মতো তালগাছটা মাথা দোলাচ্ছে। সুখদেও আবার হাঁক পাড়ল। দূরে সেই ব্রহ্মডাঙার ওপরে যেন মানুষের সাড়া পাওয়া গেল। ছেলে বুড়ো মেয়ে। দুটো লণ্ঠন দুলে উঠল। কে কথা বলছেন—সুখলাল দরাজ গলায় চোঙা হাঁকল—আমরা এসে গেছি। আমরা কমিউনিস্ট পার্টির লোক। দরাজ গলার আওয়াজ জলের ওপর দিয়ে ভেসে গেল। অন্ধকার মেঘ চিরে, বন্যা ভেদ করে, বৃষ্টির জলের শব্দকে ছাপিয়ে, বোধহয় মেঘের ডাককেও হার মানিয়ে ওরা জানিয়ে দিল—ভয় নেই আমরা এসেছি, আমরা কমিউনিস্ট—

আকাশ-ঝলসানো বিদ্যুতের চমকানিতে ওরা দেখতে পেল মানুষগুলোও ওদের দেখতে পেয়েছে। শুনতে পেয়েছে। সুব্রত অনেক দিনের পুরনো ইমোশনটাকে আবার নতুন করে বুকে টেনে নিল—লাল ঝাণ্ডা এসে গেছে—ভয় নেই। এমনি করেই—এই ভাবেই বারে বারে পৌছেছে তারা তেভাগার মাঠে, ধর্মঘটের কারখানায়—দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে—এদেশে ওদেশে—সর্বত্র।

(ক্রমশ)

শ্রীকৃষ্ণের পট

প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায়

যেমন ধরা যেতে পারে যে-কোনো একটা সম্পর্ক। আমার মা ছিল না। কথাটা নির্বিকার হতে কিন্তু এত সহজে হয় নি। গুন গুন করে গান বা রাত্রের পাতা নড়ার শব্দে মাকে মনে পড়ত। মনে পড়ায় অল্প ব্যথার আঁচে একটা আনন্দ যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে সেঁকে উঠত।

তাই বলে মাকে আমি দেখেছি—তা নয়।

মা মারা যায় তখনও আমি এক বছরের হই নি।

সিঁড়ির নিচে একটা কাঠের বাক্সের ওপর বসে একটা ইংরেজি বইয়ের ছবি কাটতাম—বায়স্কোপ হবে। রমা আমার সাফল্যে আস্থা রাখত—সেলায়ের কাঁচি মা ঘুমলে নিয়ে আসত। আমি নিজে আনতাম না। মা আমাকে শনি বলে। বলে যে-কাজে আমি হাত দি দ' পড়ে। শনি বললে আমি ভীষণ চটে যেতাম। একদিন ছাদ থেকে টব ফেলে দিয়েছিলাম।

দুপুরবেলা একটা পুরনো ব্লেড জোগাড় করে আমার সেই সিঁড়ির নিচে কাঠের বাক্সের ওপর বসে ছবি কাটছিলাম। আজ শনিবার। দাদা স্কুল থেকে ফিরল। মা বোধহয় এখনও ঘুময় নি। সিঁড়িতে খালি পায়ের শব্দে বুঝলাম রমা।—এত দেরি করলি যে?

—ছাদে গিস্‌লাম—নে।

—কী, ইস্ কুলের আচার—আর একটু দে—এ।

—আর চাইবি না।

—কাঁচিটা আনলি না?

—মা ঘুময় নি।

—দাদা কী করছে রে?

—মার কাছে শুয়ে গল্প করছে।

ব্লেডটা চাপ দিতে গিয়ে ভেঙ্গে গেছে। আমি উঠে পড়লাম।—'যাই মার

কাছে শুইগে।' আমি মার কাছে শুতে কোনো দিন ভালবাসি না। আজ হঠাৎ কি জানি কেন জেদ চাপল।

রমা বলল, 'না। আয় ছবি কাটি।' আমি শুনলাম না।—নাঃ।

রমা বলল, 'আমার মা তোর মা নয়।' আমি রমার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

রমা বলল, 'আমার মা তোর জেঠাইমা।' আমি বিশ্বাস করলাম না। আমি মার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। মা দাদার দিকে পাশ ফিরে শুয়েছিল। মা কথা বলল না। আমি মার গায়ে হাত দিলাম। মা কথা বলল না।

লণ্ঠনের আলোয় আমরা পড়ি। চোখ দুটো ঘষে নিলাম। চার্জ অফ্ দি লাইট ব্রিগেড পড়ছিলাম। রমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়েছে। ও আজকাল শাড়ি পরে। ও আমার লণ্ঠনের আলোয় পা ছড়িয়ে বসে রুমালে ফুল তোলে। আমি পড়লে রমা চুপ করে। জিজ্ঞেস করল, 'তোর চোখ লাল হয়েছে কেন রে!'

বললাম—কী একটা পড়েছে। রমা আমার কথা বিশ্বাস করল না। আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। আমি রমার কথা বিশ্বাস করি। রমা আমার চেয়ে এক বছরের বড়। আমাকে অনেক কথা বোঝাবার চেষ্টা করে। উপদেশ দেয়।

আমি শুনি। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমি ওর কথা শুনি না। আমি অন্য কথা ভাবি। হয়ত আমার মা রমার মতো দেখতে ছিল। রমা খুব ফর্সা। আমার মাও খুব ফর্সা ছিল।

আমি রমাকে হঠাৎ প্রশ্ন করি, তোর মুখটা আমার মার মতো! কথার মধ্যে রমা বলে—'হ্যাঁ। তাই হবে—কি জানি—আমি তো কাকিমাকে দেখি নি। কাকাকে একটা চিঠি লেখ না।'

একদিন আমি চিঠির বাক্স খুলতাম।

এখন কাকার নাম শুনলে ভীষণ রাগ হয়। আমি নিমগাছের পাতার দোলা দেখি। ছাদে দাঁড়িয়ে পাতা নড়ার শব্দ শুনি।

কাকাই আমার বাবা। রমার কাকা আমার বাবা। কাকার অনেক টাকা। রমা বলে তোকে দেবে। আমি ঠিক করি কাকার টাকা নেব না। কোনো দিন ছোঁব না। রমার কাকা আমার বাবা।

—আমি তো জানি না। 'আপনাকে আমি চিনি না।'

—ছিঃ। রমা রাগ করে। রমা আমাকে অনেক কথা বলে।

একদিন রমা বলল, জানিস মামিমা কলকাতা থেকে আসছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম মামিমা ভালো না রাগী?

রমা বলল রাগী নয়। দেখিস খুব সুন্দর দেখতে।

মামিমাকে দেখলাম। লম্বা ফর্সা গোল গোল হাত। খুকুকে পাউডার মাখিয়ে দেয়। খুকু মামিমার মেয়ে। আমি দেখি মামিমা খুকুকে আদর করে—চুমু খায়।

আমার খুকুকে খুব ভালো লাগে। আমি খুকুর হাত ধরে বেড়াতে যাই। আমি খুকুর সঙ্গে খুব কথা বলি। মামিমার সঙ্গে বেশি কথা বলি না। মামিমা বলেন, এদের দুজনের দেখছি খুব ভাব। বলে হাসেন। আমি মামিমার মুখের দিকে একবার দেখে নি। মামিমাকে আমার মা বলতে ইচ্ছে হয়। আমি মনে মনে মামিমাকে মা বলি। রমার মাকে আজকাল মা বলতে লজ্জা হয়।

রাত্রে আমরা লাইন করে পর পর শুই। আমি রমা, খুকু, মামিমা আর শেষে রমার মা। আমরা তিনজনে শুয়েছিলাম। প্রথমে খুকু ঘুমলো তারপর রমা। আমার ঘুম এল না। আমি শুয়ে শুয়ে কত কী ভাবছিলাম। মামিমা আর রমার মা এ-সময় শুতে এল। আমি ঘুমবার চেষ্টা করলাম।

মামিমারা ধীরে ধীরে গল্প করছে। অনেক কথা আমার কানে আসছে—আমি বুঝতে পারছি না। আমি চোখ বুজিয়ে ঘুমবার চেষ্টা করছি। একটা বাজল। অন্ধকারে সাদা সাদা গুঁড়ি গুঁড়ি কি যেন ভাসছে। আমি চোখ খুললাম। এতক্ষণ চোখ বন্ধ করে কষ্ট হচ্ছিল। আমার ঘুম আসছে না। শরীরটা ঘামে ভেজা-ভেজা। এবার ওদের কথার মধ্যে রমার কাকার কথা এল। কাকার কথা উঠলে আমি সজাগ হই। আমি চুপি চুপি নিঃশ্বাস ফেললাম। রমার মার কথাগুলো আমার বিশ্রী লাগছিল। মামিমাও যেন কথায় সায় দিচ্ছে। আমার কাকার ওপর ভীষণ রাগ হয়। মামিমাও কি যেন বলছে। আমার ঘুম আসছে না…। আমার চোখ জ্বালা করছে। আমি ওদের কথা শুনব না। আমি একটা পা দিয়ে আর একটা পা চাপছি। আমার ঘুম আসছে না। আমার কী আজ ঘুম আসবে না? কান্না চাপতে চাপতে আমার শরীর কেঁপে উঠল।

আমি রমাকে বললাম। রমা বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পাশ করে আয়নার দিকে তাকিয়ে কাঁধের ওপর আঁচলটা ছোট করছিল। আমার কথায় রমা মন দিল না। আমি আয়নার সামনে আড়াল করলাম। রমা এগিয়ে এল—সর। কী বলছিস! কাল রাতের কথা বললাম। বললাম—মামিমাও সায় দিচ্ছিল।

রমা হাসল। রমার কথা শুনে মনটা আরও ভার হল। মনে মনে বললাম, মামিমাকে আর মা বলব না। কিন্তু একদিন মামিমা কি এক ঠাকুর পুজো দিয়ে এসে আমায় মিষ্টি দিয়ে মাথায় হাত রাখলেন। আমার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল। আমি মামিমার হাতের নিচ থেকে মামিমার মুখের দিকে তাকালাম। মনে মনে বললাম, আমার মা। আমার খুব ভালো লাগল।

আমি শান্ত হয়ে গেছি। আমি ছাদে দাঁড়িয়ে অন্ধকার দেখছিলাম। মোষের পিঠের মতো কালো অন্ধকার। অন্ধকার কেটে কেটে বাদুড়গুলো উড়ে যাচ্ছে। রমা বলত বাদুড়ের নাম করলে ওদের খাওয়া হয় না। আমি হাসলাম। রমার বিয়ে হয়ে গেছে। রমা নেই। কেউ ছাদে আসে না। আমি ছাদে থাকলে দাদা ছাদে ওঠে না। দাদা থাকলে আমি উঠি না।

আমি কলেজ ফেরৎ রোজ চিঠির বাক্স খুলি। শব্দ হয়। শব্দর সঙ্গে রমার মা একটা-কিছু কথা ভাসিয়ে দেয় আমার কানে আসে বা আসে না। দাদার কথা—থাক।

আমি মামিমাকে চিঠি দি। রমা আমাকে চিঠি দেয় না। আমি সেবার যখন কলকাতায় গেলাম রমা কাঁদল। বলল; 'তুই কাকার সঙ্গে দেখা কর।'

আমি মামিমার সঙ্গে দেখা করলাম। মামিমা প্রথমে আমায় চিনতে পারেন নি। আমি নাকি ভীষণ বড়সড় হয়ে গেছি। মামিমা মাথায় ঘোমটা তুলছিলেন। আমি হাসলাম। অন্ধকারের মধ্যে কত কথা ঘুরছে।

মনে হয় মামিমার কাছে চলে যাই—কলকাতায় লেখাপড়া করব। কিংবা দূরে কোথায়। মামিমার কষ্ট হবে। ভাবতে ভালো লাগে—আমার জন্যে মামিমার কষ্ট হবে। মামিমা আমাকে ছেলেমানুষ ভাবেন। ছেলেমানুষের মতো করে ব্যবহার করেন। সেবার আমার লজ্জা করছিল। মামিমা হেসে হেসে আমার বয়স শরীর বাড়াটাকে উড়িয়ে দিলেন—ছতু বাবু—ইঃ —বা—বু

না। আমার মুখ মামিমা নিজের মুখে চেপে ধরলেন। আমার লজ্জা করছিল। ঘরে খুকু ছিল। খুকু অনেক বড় হয়েছে। মামিমার মনে হল বয়স বাড়ে নি। পানে ঠোঁট লাল—কপালে লাল সিঁদুর।

মামিমার কথা মনে পড়লে আমি বুঝতে পারি সমস্ত মুখে একটা খুশির আমেজ শিশিরের মতো নিশব্দে জমতে থাকে। কিন্তু মামিমা আমাকে চিঠির উত্তর দিল না। আমি মামিমাকে যে চিঠিটা দিয়েছিলাম তার উত্তর এখনও এলো না। আমি লিখেছিলাম—আমি মিলিটারিতে ভর্তি হচ্ছি। আমি জানতাম মামিমা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেবেন। আমি মিথ্যে মামিমাকে ভয় দেখাই নি।

দাদা আমার সঙ্গে কথা বলে না। আমি রমার মার সঙ্গে কথা বলি না। দাদার সঙ্গে আগে তবু বা ঝগড়া হত, আজকাল আমরা এড়িয়ে চলি। দুজনেই। আমি যদিও বা কখন অসতর্ক হই দাদা সর্বদা সচেতন। সেদিন জানতাম না দাদা ছাদে, আমি উঠতে দাদা নেমে গেল।

আমি কোনো একটা অজুহাতে এখান থেকে চলে যেতে চাই। আমি যদি কলকাতা যাই এরা মনে করবে খুকুর জন্যে আমি কলকাতা গেলাম। এরা বলে আর বলবে এমন কী রমাও—যে আমি খুকুর প্রেমে পড়েছি। আমি খুব সহজে কলকাতা যেতে পারি। কিন্তু আমি যেতে পারব না। আমি যে খুকুর প্রেমে পড়ি নি, আমি প্রমাণ করব। আমি কলকাতায় তাই মামিমার জন্যে যাবার প্রচণ্ড ইচ্ছে থাকলেও যাব না। আমি জানি তা সত্ত্বেও রমার মা চিবিয়ে বলবে, আমরা তো এখন পর হয়ে গেছি। আমি মনে রাখি আমি তোমাদের কাছে মানুষ হয়েছি। কিন্তু আমি যে মামিমার কাছে মায়ের স্নেহ পেয়েছি।

ছোটবেলায়, যদিও এখন হাসি পায়, রাস্তায় চলতে চলতে ভাবতাম কোনো একজন বৌ আমার মার মতো দেখতে আমায় দেখতে পেয়ে দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরবে—যদি সত্যি সত্যি হয়। বলবে আমার খোকাকে পেয়েছি। চল খোকা বাড়ি চল বাবা। চোখে জল। চল বাবা বাড়ি…৷ কত কী কল্পনা করতাম।

মামিমা অসুস্থ নয় তো! চিঠির জবাব দিতে পারছে না। এতদিন তো হয় না।

এতদিনে হয়তো বা আমি কোনো ভারতীয় সৈনিক। আজ এই ভাবে

অন্ধকার আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে জানি না কী ভাবতাম। কিন্তু আজ আমি কলকাতার কোনো একটা বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে দূরে রাস্তার ট্রামের তারের স্পার্ক দেখছি। নিচে বস্তির অনেক ঘর তারপর একটা বাড়ি। বাড়ির বারান্দায় লণ্ঠনের আলোয় একটি ছেলে আর একটি মেয়ে মাদুর বিছিয়ে। মেয়েটা পা ছড়িয়ে বসে, ছেলেটা চিৎকার করছে M-A-N ম্যান। ম্যান—মানে…

আমি দেখছি ওই ছেলেটা ; ওই মেয়েটা—মেয়েটা পা ছড়িয়ে—হ্যাঁ হয়তো রুমালে ফুল তুলছে।—রমা।

রমা নাকি কাকার কাছে গিয়ে কেঁদেছিল, বলেছিল, সতু চলে যাবে। আমার মিলিটারিতে যাওয়া হয় নি।

কাকার চিঠি পেয়ে ছিঁড়লাম না। কাকার চিঠি পড়লাম। পড়ে মনে হল লোকটা আমার বাবা। আমি কলকাতায় এলাম। কাকা বললেন, তুমি হোস্টেলে থাকবে।

আমার মামিমার কাছে থাকবার ইচ্ছে মনে মনে রয়ে গেল। এতদিন সত্যি কথা সোজা প্রকাশ করতে পারি বলে মনে যে একটা দম্ভ ছিল এই লোকটির সামনে দাঁড়িয়ে রইল না। আমি বললাম, আচ্ছা।

আমি রোজ মামিমার কাছে যেতাম। খুকু আমাকে এড়িয়ে যেত বা লজ্জা পেত তা নিয়ে ভাবতাম না, ইচ্ছে হলে খুকুকে ডাকতাম। সব সময় ও আসত না। ওর না আসা আমার উপেক্ষা মনে হত। রাগ হত।

রোজ এসে আমি মামিমার গা ঘেঁসে বসতাম। বিরক্ত করতাম। মামিমা প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় মাখিয়ে ধমক দিত। হয়তো বলত—আমি কখন থেকে খাবার করে ঠায় বসে আছি দুষ্টু ছেলে এতক্ষণে আসা হল। আমি রোজ দেরি করতাম।

রমার সঙ্গে দেখা করতাম অনেকদিন অন্তর অন্তর। একটা হিসেব-করা সময়ের পর দেখা করতাম। হিসেব ভুল হত না। আমি গণিতজ্ঞ আমার ভুল হল মারাত্মক ভুল। তারপর আমি আমাকে উপহাস করি। এই ছাদ থেকে মুড়ে-ঝুড়ে খালি সিগারেট প্যাকেটের মতো ফেলে দিতে পারলে যেন নিশ্চিন্ত হতাম।

আমি দেখছি আমি শুনছি ওই ছেলেটা পড়ছে—M-A-N ম্যান—ম্যান মানে…। ছাদের অন্ধকার আমাকে ঘিরে ধরেছে। বস্তির মাঝখানে যে

নিমগাছটা—পাতা অল্প অল্প দুলছে। ওই ছেলেটার পাশে পা ছড়িয়ে বসে আছে ওর দিদি, কাঁথায় নকশা করছে। দূর থেকে মনে হল রুমালে ফুল তুলছে। আমি পড়তাম রমা রুমালে ফুল তুলত। এই ছাদ সেই কতদিনের পুরনো—আমি কোথায়—আমার বয়স কত আমি কে, সমস্ত অন্ধকারে মিলিয়ে গেল—আমিও···। কে যেন ছাদে উঠল। আমার পাশে এসে দাঁড়াল—রমা। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমি মন খারাপ করে ছাদে দাঁড়িয়ে থাকলে রমা এসে আমার মুখের দিকে তাকায়। একটা হাত আমার কাঁধের ওপর রাখতে আমি চমকে উঠলাম।—রমা মারা গেছে ছ-সাত মাস। রমা নেই।

—আমি খুকু।

—খুকু! খুকু!

আমি খুকুকে বিয়ে করেছি।

সত্যি বলতে আমি কিন্তু খুকুর জন্যে মামিমার কাছে যেতাম না। মামিমা।

মামিমা যদি বলত, সতু এই বাটিতে বিষ আছে নাও খেয়ে নাও।—আপনি বলছেন—আপনি আমায় বিষ খেতে বলছেন? আমি মামিমার কথায় মরতে পারলেও যেন ধন্য হতাম।

আমি মামিমার হাত ধরে টানলাম, চলুন শুতে যাই। কারণ এটা আমার ইচ্ছে হল তাই। তবে এ-ইচ্ছেটা একদিনে আমার দিক থেকে পুষ্ট নয়।

মামিমা আমায় আদর করে যেন আমি সেই ছোট্ট সতু। আমার মুখে মুখ ঘসে বলে আমায় পাগল ছেলে। মামিমা এখনও সুন্দর। আমার শরীর নিঃশব্দে অবশ হয়। আমার তেইশ বছরের ভ্রামক যৌবন নিজেকে চোখ রাঙায়।

আমার শেষ পরীক্ষার ফল ভালো হল না। কাকা আমার দিকে সোজা তাকালেন। আমি কলকাতায় থাকার প্রয়োজনীয়তা আগেই বলেছিলাম। আমি কাকার কাছে চুঁচুড়ায় এই কদিন মামিমাকে না দেখে আমার চুঁচুড়ায় থাকা অপাঙক্তেয় হয়ে উঠেছে।

কাকা বললেন—যাও। পরে চাঁদুর ওখানে ব্যবস্থা করে নেবে। আমি লিখে দেব। চাঁদু আমার খুড়তুতো ভাই। এক সামাজিক অনুষ্ঠানে সেদিন আত্মীয়দের সমাগমে উক্ত চাঁদুদার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। কাকা বললেন—জানি মামিমা তোমাকে ছেলের মতো স্নেহ করেন। দুচার দিন থাক তারপর প্রয়োজন হলে চাঁদুর ওখানে যাবে।

প্রয়োজন কথাটা এলো কারণ কাকার একটা বাড়ি হয়তো তার আগেই খালি হতে পারে তেমন কথা আছে।

কাকার কথায় আমার মনে অতর্কিতে চাবুক পড়ল। 'তোমাকে ছেলের মতো স্নেহ করেন।' এ লোকটার সামনে আমি সোজা হতে পারলাম না। আমি মামিমার কাছে কয়েকদিন থাকব।

থাকবটাকে আমি কেমন সন্দেহের চোখে দেখছিলাম। একটা অপরাধ-বোধ আমার মনের মধ্যে পাক খাচ্ছিল। আমি মামিমাকে ঠিক মায়ের মতো ভাবতে ভীষণভাবে চেষ্টা করে মনটাকে একটা চিন্তা থেকে বার বার সরাতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। তবু আমি আমাকে মামিমার কাছে নিয়ে এলাম।

আমি আর মামা এক ঘরে অন্য ঘরে খুকু মামিমা নন্দ। ভোরে গঙ্গা স্নানে মামা ভাঙ্গা স্বাস্থ্য ফেরাতে একাগ্র। মামার অনেক দিনের অভ্যাস। আমি মামা বেরিয়ে যাবার অপেক্ষায় অনেক রাত থাকতে জেগে চোখ বুঁজিয়ে পড়ে থাকি। অপেক্ষায় থাকার মধ্যে আমি বা ঘুমিয়ে পড়ি। মামিমার আলিঙ্গনে যেটা কী আমার রোজকার অভ্যাস এবং যার, আমি মনে করি স্বত্বাধিকারী, আমার ঘুম ভাঙ্গে। একটা নীরব পাপবোধ আমার মনটাকে জারিয়ে তোলে। আমার সমস্ত দেহ মামিমার সমস্তকে মাতৃত্বের অবয়ব বলে স্বীকার করতে পারে না। আমার কষ্ট হয়। ভীষণ কষ্ট হয়। মামিমার আলিঙ্গনে আমার শরীর কেমন এক অদ্ভুত হয়ে কাঁপে। একটা প্রশ্ন আমায় কোপায়—মামা বেরিয়ে গেলে মামিমা আসে···তবে কী?

তবে কী কে আমি অতিক্রম করতে পারি না। কোনো দিন পারছি না। —'আমার পাগল ছেলের কত আব্দার।'

আমি মামিমার বুকে মুখ গুঁজে দি।

আমি হোঁচট খাই। আমি ছেলে! ছেলে!—নাঃ না···আ। আমি পাগলই হলাম। এক চরম নিষ্পত্তির জন্যে আমি তলিয়ে যাচ্ছি। আমি মরিয়া হলাম। আমি মামিমার মুখে চুমু খেলাম।

—সতু—একী—তোমার মন—ছিঃ ছিঃ আমি তোমার মায়ের মতো না?

—আমি কিছু জানি না। জানি না।—নাঃ—আমায় যা কিছু ভাবুন। যা কিছু ভাবুন বলেছিলাম। কিন্তু আমি সমস্ত সকাল ধরে ভাবলাম। মামিমার ছিঃ কথাগুলো আমায় ছেঁচে ছেঁচে অবশ করেছে।

দুপুরে আমি মামিমার হাত ধরে টানলাম, চলুন শুইগে। আমি সকলের সামনে মামিমাকে নিয়ে যাব। আমি পরীক্ষা করব। শুধু মামার অনুপস্থিতিতে আমার প্রতি ওই রকম না সত্যি ওটাই মাতৃত্বের আবেশে মামিমার নির্জলা প্রকাশ।

মামা ঘরে ঘুমচ্ছেন। খুকু অন্য ঘরে বসে হয়তো লুডো খেলছে।

মামিমা বললেন—এখন না অনেক কাজ আছে। আমি জোরে টানলাম—না চলুন···

—আঃ কী যে ছেলেমানুষী কর—

—না যেতেই হবে।

—পাগলামী কর তুমি—। নাঃ ছাড়।

কিন্তু ওই বিরক্তিকর বন্ধ্যা শব্দগুলোয় আমার রক্তে নেশা ছড়িয়ে দিল। —না। আমি কিছু শুনব না। আমায় গায়ে হাত বুলিয়ে দেবেন আমি ঘুমব।

মামিমা হাসি টেনে আমার দিকে তাকালেন।—তুমি বড় অবাধ্য। বলছি এখন নয়।

অবিশ্বাসে আমার মন দাপছে। এক হেঁচকায় মামিমাকে তুলে ধরলাম—চলুন। মামিমার চাবির গোছা বাঁধা আঁচল মাটিতে শব্দ করে পড়ল। মামিমা আমাকে চড় মারল।—ছাড়ো বলছি।

জোর করে হাত ছাড়িয়ে আঁচল জড়াতে জড়াতে মামিমা মামার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

আমি চিৎকার করে উঠলাম—খুলুন। আমি লাথি মেরে দরজা ভেঙ্গে দেব। আমি···। খুকু সামনে এসে আমার এক হাত ধরল—কী হচ্ছে তোমার এ সমস্ত!

এ সমস্ত···আমার···। আমি খুকুর দিকে মরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলাম।

—শোন। এস আমার সঙ্গে।

আমি হঠাৎ কী হয়ে গেলাম—আমার ভারী অন্যায় হল···।

—তুমি মাকে এখনও চিনলে না!

আমি একটু আগেই যেন কী করে বসতাম। আমার মাথা দপদপ করছে। আমি খুকুর সব কোথায় মন দিতে পারলাম না।

সম্পর্কে খুকুর কাকা এখানে ছিল—মামিমার সঙ্গে···কী যেন···। খুকু তখন ছোট—তবে মামা নাকি মামিমাকে মারতে উঠেছিলেন। সেই নিয়ে খুকুর কাকাকে মামা চলে যেতে বলেন।

আমি চুঁচুড়ায় যাচ্ছি। খুকুকে বললাম।

কথাগুলো আমার মনে সাংঘাতিক স্তর ফেলল। খুকু হঠাৎ এ সমস্ত··· মামিমা তাহলে···আমি কী।

কাকার প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে পারতাম।—হঠাৎ—!

চাঁদুর বাড়িতে উঠে গেছ তো?

—কাল যাব। হঠাৎ কী মনে হল তাই এলাম।

চুঁচুড়ায় থাকব বলে এসেছিলাম। আবার ফিরলাম। এবার চাঁদুদার বাড়ি। কলকাতা থেকে দূরে—মামিমার সংস্রব থেকে দূরে থাকব বলে স্থির করলাম। আপাতত আমি কলকাতায়। চাঁদুদার বাড়িতে। আমাকে দেওয়া ঘরখানা ভালো। আমার ঘরের একপাশের জানলার পাশ দিয়ে জলের পাইপ। খানিকটায় জং-ধরা। খুব অল্প প্রায় অদৃশ্য ভাঙ্গার জলে ওই জং আর দেয়ালটা একটু ভেজা কালচে।

আমি চাঁদুদার বৌয়ের সঙ্গে কথা কইলাম যাকে আগে অনেক বার এড়িয়ে গেছি।

কারণ খুব সতর্ক মাপা ওজন-করা কথায় আমি কথা হারিয়ে ফেলি।

আমি হাঁপিয়ে ছাদে উঠলাম। গরু খেদানোর মতো করে মনটাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছি। মনে হচ্ছে মামিমার বাড়ি তো খুব কাছে—মন থেকে থেকে নানা কায়দায় কথাটা তাড়াতে চেষ্টা করছি। ছাদটা পরিষ্কার। এক কোণে জলের ট্যাঙ্ক। এই ট্যাঙ্কের পাইপ আমার জানলার পাশ দিয়ে নিচে নেমেছে। দুটো বাঁশের মধ্যে এরিয়াল ঝুলছে। আমি কলকাতায়, মামিমা কলকাতায় থাকে। বেড়াতে বেড়াতে একবার ওই দিক দিয়ে ঘুরে এলে··· ভাবলাম। খুকুর কথাগুলো মনে পড়ল। ঘৃণায় মুখ বিকৃত হয়। রাত্রে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি বাইরে এলাম। সিঁড়ির দরজায় তালা। আমি ছাদে উঠলাম। জলের পাইপ ধরে নীচে নেমে মামিমার বাড়ির কাছাকাছি ঘুরে আসি। দূরে কোথায় বারোটা বাজল। এখন মামা খুকু নন্দ মামিমা সবাই ঘুমচ্ছে। ছাদে পাইচারি করতে করতে আমি ক্লান্ত

হলাম। চারটেয় মামা গঙ্গাস্নানে বেরিয়ে যান। আমি ঘুমিয়ে নি। আমি ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম।

আমার উঠতে বড় দেরি হল। আমি লজ্জিত হলাম। রাত্রে আমায় যদি কেউ দেখত !

দুপুরে আমি কোনো কাজের গুরুত্ব বোধে বাড়িতে থাকতে পারলাম না। রাস্তায় হঠাৎ একটা সিনেমা-হলে ঢুকে পড়লাম। রাত্রে বাড়ি ফিরলাম। ট্রামের বাসের টিকিটের সঙ্গে সিনেমার টিকিট দেখলাম। মনে পড়ল সিনেমা দেখেছি। হলটার নাম দেখলাম।

রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিকারগ্রস্তের মতো আমি ছাদে উঠে এসেছি। আমি আজ একবার মামিমার বাড়ির সামনে দিয়ে ঘুরে এসেছি। মামিমার ঘরে আলো ছিল। আমি। শরীর ভীষণ ভারি। চারিদিক নিস্তব্ধ, বন্ধ। মামিমাকে গিয়ে বলব আমি এলাম। আমি ট্যাঙ্কের দিকে এগিয়ে গেলাম। পাইপে হাত দিলাম। পাইপ ধরে আমি কেমন করে যেন নেমে এলাম। আমার মনে পড়ল না—পাইপে জং-ধরা, ভাঙ্গতে পারে।

আমি মামিমার বাড়ির কাছে এলাম। শুনলাম তিনটে বাজছে। চারটেয় মামা গঙ্গাস্নানে বার হল। আমি নানা ভাবে ঘুরে ঘুরে সময় কাটালাম। অনেক বার ঘুরে এসে দেখলাম মামা বার হন নি।

মামা গঙ্গা স্নানে বেরুলেন। আমি ঢুকলাম। আমার মনে আর ভয় নেই। মামিমা অবাক হলেন না। মামিমা বললেন—জানতাম। আমাদের রাহুর আলিঙ্গনে মামিমার কথা জড়িয়ে গেল।

—সতু। থাক্।

আমি মামিমার ভেজা-ভেজা কথা শুনতে পাচ্ছি না। আমার আদিম আমি সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে প্রাগৈতিহাসিক মুক্তি চাইছে।

মামিমার সোনার চুড়ি হাতে বেঁকে গেল।

—না—না। আমি তোমার মায়ের মতো···।

—বেশ্যা। দাঁতে দাঁত চাপলাম।

না হ্যাঁ ঘুরতে লাগল।

তারপর···।

তারপর···তারপর অনেক তারপর পেরিরে আমি খুকুকে বিয়ে করলাম।

অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ

রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার যোগাযোগের সূত্রপাত ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে। সে-বছর নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ও প্রধান অধ্যাপক হিসাবে তিনি পুনরায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছেন। আমি তাঁর প্রথম দলের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। তাঁর সঙ্গে আমার সেই সাহচর্য তাঁর মৃত্যুর দিন (৩১শে মে, ১৯৬৩) পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

তখনকার দিনে নৃতত্ত্বের কর্মক্ষেত্র বলতে নৃতাত্ত্বিকেরা যা বুঝতেন শিক্ষক হিসাবে তার থেকে স্বতন্ত্রভাবে তিনি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলেছিলেন। তিনি আমাদের ঔৎসুক্য "খণ্ডজাতির" জগতে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, বা "আদিম" মানুষের সারল্য ও অজানা প্রথার দ্বারা আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করতে চান নি। বিভিন্ন সমাজকে তিনি স্তরভেদের ধারায় উপস্থিত করতেন, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, দর্শন, পরিসংখ্যান, রাজনীতি ও অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গী ও ধারণা দিয়ে শাস্ত্রটির মূলকথাগুলি বিষয়মুখভাবে ব্যাখ্যা করতেন।

১৯৩৭-৪১ সালে এই পদ্ধতির প্রয়োগ ভারতবর্ষে নৃতত্ত্ব শিক্ষকের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসাবে গণ্য হবে এবং অন্তত শুধু এই জন্যও অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় চিরকাল স্মরিত হবেন।

তখনকার দিনে গবেষণার কাজে হাত দেওয়া দুরূহ ব্যাপার ছিল। সবচেয়ে বড় বাধা ছিল টাকা-পয়সার অভাব। আমি দেখেছি, তাঁর ছাত্র-গবেষকরা যাতে জীবনধারণের উপযোগী ভাতা পেতে পারেন তার জন্য নানা ব্যক্তি ও কমিটির কাছে তাঁকে কি পরিমাণ তদ্বির তদারক করতে হয়েছে। এইভাবে ক্রমে ক্রমে তিনি নৃতত্ত্ব বিভাগে গবেষকদের একটি দল গড়ে তুলতে পেরেছিলেন—আজ তাদের সামনে গবেষণার সব সুযোগ-সুবিধা অবারিত।

১৯৪৩ সালের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের দিক দিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিন্ন হয়। কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্র ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছিল আর সেই দিক দিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ কখনও বিচ্ছিন্ন

হয় নি। ১৯৪৪-৫০ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিটিউট ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নানা কাজে সহযোগিতা করেন, ১৯৫০-পরবর্তীকালে ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স, প্ল্যানিং কমিশন ইত্যাদির সমাজবিষয়ক নানা গবেষণায় অংশ নেন। এই সময় তিনি আন্তর্জাতিক নৃতাত্ত্বিক সংগঠন ও সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ফ্রান্সের C. I. A. P-র সহ-সভাপতি ছিলেন।

নিজের নৃতত্ত্ব বিভাগেই হোক আর অন্যত্রই হোক, নিজেকে কোনরূপ জাহির না করে তিনি তাঁর কাজ করে যেতেন। তিনি এমন একটা ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ হিসাবে প্রথম কয়েক বছরের পর নৃতাত্ত্বিক হিসাবে বা নৃতত্ত্বের জন্য তিনি আর কিছু করেন নি। কেন যে তিনি এরূপ ধারণা সৃষ্টি হতে দিয়েছিলেন তা অবশ্য আমার জানা নেই। প্রথম কয়েক বছরে তিনি তাঁর বিভাগে যে আমূল পরিবর্তন এনে ছিলেন তা কারোর চোখ এড়িয়ে যাবার উপায় ছিল না কিন্তু হঠাৎ আলোর ঝলকানির মধ্যে স্থির দীপশিখার অম্লান দীপ্তি হয়তো চোখ এড়িয়ে যায়।

এই কারণেই হয়তো ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে তিনি যখন নীরবে নৃতত্ত্ব বিভাগ থেকে অবসর নেন তা অনেকেরই চোখে পড়ে নি। তিনি অবশ্য নৃতত্ত্ব বিভাগ একেবারে ছাড়েন নি, এর প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অকৃত্রিম। অবসর গ্রহণের পর যদিও নানা প্রতিষ্ঠানে তুল্য মর্যাদায় যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ এসেছিল তিনি তা গ্রহণ করেন নি, অবৈতনিক অধ্যাপক হিসাবে তিনি নৃতত্ত্ব বিভাগেই থেকে যান এবং C. S. I. R. ও ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনষ্টিটিউটের কিছু অর্থ বরাদ্দ পেয়ে নিজের অধীনে কিছু গবেষক-কর্মী রেখে গবেষণার কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন।

সারা জীবন নানা ধরনের কাজে লিপ্ত থেকে অত্যধিক পরিশ্রম করায় ১৯৫০ সাল থেকেই তার স্বাস্থ্যে ভাঙন ধরে। ১৯৫৫ সালে তিনি গুরুতর-ভাবে পীড়িত হন। "স্বাভাবিক" মানুষ হিসাবে তখনই তাঁর অবসর নেওয়া উচিত ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর গ্রহণের পর তো নিশ্চয়ই আর কাজ করা অনুচিত ছিল। কিন্তু তা তাঁর মনঃপূত ছিল না। তিনি বলতেন, "কাজ না করতে পেরে বেঁচে থাকাটাকেই আমি সবচেয়ে ভয় করি।" সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ হিসাবে জীবনকে

তিনি নিশ্চয়ই ভালোবাসতেন, কিন্তু জীবন তাঁর কাছে প্রাণধারণের অধিক কিছু ছিল।

১৯৬৩ সালের ১লা মে শেষবারের মত রোগে পড়বার মাত্র একদিন আগেই আগামী কয়েক বৎসর কি ধারায় গবেষণা চালাবেন তার একটি পরিকল্পনা তিনি প্রস্তুত করেছিলেন। মৃত্যুর কয়েক মাস আগেও ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে গবেষক সহকারীদের সঙ্গে তিনি গ্রামে গিয়েছেন ফিল্ড ওয়ার্কের তদারক করতে।

১লা মে-ও তিনি যথারীতি কাজকর্ম করেছেন। সকালে অন্ধ্র বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম. এস-সি'র খাতা দেখেছেন। দুপুরের দিকে তাঁর অধীনস্থ এক গবেষণাকর্মীর ডি-ফিল থিসিস-এর একটি অধ্যায় সংশোধন করেছেন। দুটোর সময় তিনি একটু শুয়েছিলেন বিশ্রাম নিতে। ইচ্ছে ছিল তিনটের সময় উঠে আবার কাজ শুরু করবেন। কিন্তু তাঁর এই নিত্য নৈমিত্তিক রুটিনে ছেদ পড়ল।

বেলা তিনটেয় তিনি গুরুতরভাবে পীড়িত হয়ে পড়লেন। সেই পীড়া তাঁকে ৩১শে মে পর্যন্ত শয্যাশায়ী করে রাখল। ৩১শে মে বেলা ১১-৩০-এ তাঁর কর্মজীবনে চিরবিরতি ঘটল।

কিন্তু যদিও তিনি নিজে আর কাজ করতে পারবেন না, কিন্তু যে কাজের নির্ঘণ্ট তিনি তৈরি করে দিয়ে গেছেন, তাঁর গবেষক ছাত্র ও সহকারীরা এখন কয়েক মাস তার ভিত্তিতেই কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন, অন্য কারোর নির্দেশ ছাড়াই। এবং পরে সামান্য সহায়তা পেলে এ-কাজ আরও কয়েক বছর চালিয়ে যাওয়া যাবে।

ঠিক এইটেই তাঁর কাম্য ছিল। শারীরিকভাবে তিনি না থাকলেও তাঁর কাজ নীরবে কিন্তু নিশ্চিতভাবে এগিয়ে যাবে, প্রথমটা নিজের গতিতে, পরে তাঁর বিদ্যার উত্তরাধিকারীরা সে কাজের দায়িত্ব তুলে নেবেন।

কাজের প্রতি এইরূপ আত্মবিলোপকারী নিষ্ঠা অতীতে অনেক সময়ই চোখ এড়িয়ে গেছে। এখনও যদি তা যায় তবে তার মধ্য দিয়ে সমাজের এমন একটা ব্যাধি প্রকাশ পাবে যার সম্পর্কে সাবধান হবার দিন এসেছে।

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের কর্মধারা বিচিত্রপথগামী ছিল। ওপরে ওপরে দেখলে বলা যেতে পারে যে যদিও তিনি কঠোর পরিশ্রম করতেন, তা ছিল

তাঁর শক্তির অপব্যয়। "কৃতিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত" সমাজে এইরূপ ধারণাই প্রবল হয়ে ওঠে, বিশেষ করে তিনি যখন তাঁর বিচিত্র কর্মপথ পরিক্রমা থেকে রাজস্ব আদায়ে তৎপর হন নি। যে পুরস্কার তিনি আশা করেছেন তা স্বতন্ত্র ধরনের আর যে বহু বিচিত্র পথে তিনি তাঁর কর্মশক্তি ব্যয় করেছেন তার মধ্যে একটা গূঢ় মিল ছিল, যদিও গুরুত্বের দিক থেকে তাদের মধ্যে তফাৎ ছিল।

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় (১৯১৩) তিনি সপ্তম স্থান অধিকার করেন, আই-এ ও আই-এস-সি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তিসি প্রথম স্থান অধিকার করেন (১৯১৫) এবং বি-এস-সি পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যায় (১৯১৭) প্রথম শ্রেণীর অনার্স পান প্রথম স্থান অধিকার করে। ১৯১৯ সালে পদার্থবিদ্যায় এম-এস-সি পরীক্ষা দিতে গিয়ে দুটি পেপার দিয়ে 'ড্রপ' করেন। যে দুটি পেপার তিনি দিয়েছিলেন তার প্রত্যেকটিতে শতকরা ৯০ নম্বর পান।

তারপর তিনি সি. ভি. রমনের অধীনে পদার্থবিদ্যায় রিসার্চ শুরু করেন, ইংল্যাণ্ডে রিসার্চ করেন টমসন ও রাদারফোর্ডের অধীনে এবং শেষে কেম্ব্রিজে বিভার্সের অধীনে, নৃতত্ত্বে পি-এইচ-ডি থিসিস অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন বছরের "শর্ত" রক্ষা না করায় তাকে এম-এস-সি ডিগ্রি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তিনি অবশ্য নৃতত্ত্বে অ্যান্টনি-উইলকিনস পুরস্কার পেয়েছিলেন।

ইস্কুল-কলেজে "ভালো" ছাত্র হলেও "ভালোছেলে" ছিলেন না তিনি। ছাত্রজীবনেই তিনি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে এমন সব কাজে লিপ্ত হন ভারতের তৎকালীন শিক্ষা কর্তৃপক্ষ যা মোটেই সহানুভূতির চোখে দেখত না। বিলাতে থাকার সময় একদিকে তিনি যেমন কেম্ব্রিজে নৃতত্ত্ব 'ট্রাইপোজ'-এর জন্য শিক্ষকতা করছিলেন অন্যদিকে তেমনি লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান সিমেন্স ইউনিয়ন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সে সময়ে তিনি লণ্ডনে ও বার্লিনের ভারতীয় বিপ্লবী ও রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলতেন।

ভারতবর্ষে ফিরে কথা ছিল নেপালে গিয়ে নেবার সংস্কৃতি সম্পর্কে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে গবেষণা চালাবেন। কিন্তু ঔপনিবেশিক সরকার তাকে যথোপযুক্ত অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন। তাই স্যার আশুতোষ

মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু সেই বছরই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আদেশে সে কাজে ইস্তফা দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম বেতনে নবপ্রতিষ্ঠিত কর্পোরেশনের এডুকেশন অফিসারের পদ গ্রহণ করেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের এডুকেশন অফিসার হিসাবে ১৯২৪-৩৭ সালে তিনি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিক্ষকের একটি চমকপ্রদ সংগঠন গড়ে তোলেন। তিনি ১৫০০ শিক্ষককে ট্রেনিং দিয়েছিলেন শিক্ষাদান বিষয়ে এবং যাতে তাঁরা তৎকালীন রাজনৈতিক সংগ্রামের সহায়ক হতে পারেন। এইটেই ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে গর্বের বিষয়, যদিও ১৯২৪ সালে তিনটি থেকে ২২৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় তিনি স্থাপন করেছিলেন। এই থেকেই তাঁর জীবনের লক্ষ্য কি ছিল তার আভাস পাওয়া যাবে।

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের কাছে সাধারণ শিক্ষা বা বিজ্ঞান শিক্ষা, রাজনৈতিক সংগঠন বা জনকল্যাণমূলক কাজ স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না বা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা অর্জনের সোপানও ছিল না। তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল সামাজিক বিসংবাদ দূর করে সাধারণ মানুষের সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের কর্মশক্তি নিয়োগ করা। সুতরাং, যে পথ তাঁকে এই লক্ষ্যের সমীপবর্তী করবে বলে তিনি মনে করেছেন সে পথ ধরেই তিনি অগ্রসর হয়েছেন, পূর্ববর্তী পথের "বৈষয়িক" "আধ্যাত্মিক" লাভ-লোকসানের দিকে দৃকপাত না করেই।

তাই, কলকাতা কর্পোরেশনে কাজ করতে করতেই তিনি ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় হন, ১৯৩০-৩৩ সালে সমর পরিষদ নামে সংস্থার সভ্য হিসাবে। তিনি তাঁর শিক্ষকদেরও এই আন্দোলনে যোগ দিতে উৎসাহিত করেন। কিন্তু যখন তাঁর মনে হল এই আন্দোলনে তাঁর যা দেবার ছিল তা এক অচল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসতে তিনি এক মুহূর্তও দ্বিধা করেন নি, যদিও এখানে কর্পোরেশনের তুলনায় তাঁর বেতন এবং প্রভাব প্রতিপত্তি এখন অনেক কম হল।

তেমনি ১৯৪১-৪৪ সালে তিনি বাংলা কংগ্রেসের নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের সদস্য হন। পরে মহাত্মা গান্ধীর আগ্রহাতিশয্যে তিনি এর সভাপতিও হন। কিন্তু সারাজীবন কংগ্রেসের অনুগামী হয়েও যখন তাঁর মনে হয়েছে অন্যপথে গেলে তাঁর লক্ষ্য পূর্ণ হবে তিনি সে-পথ ধরে চলতে দ্বিধা করেন নি। ১৯৪৩-৪৬ সালে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মানুষদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের জন্য "বামপন্থী"

আন্দোলনের সঙ্গে প্রকাশ্যে হাত মেলাতে তিনি দ্বিধা করেন নি, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে তিনি বামপন্থীদের সমর্থনে রাজ্য বিধান পরিষদের সভ্যও হয়েছেন। সারা বাংলা কিসান সভার সভাপতি পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হলে তিনি তাতে সম্মত হন, কিন্তু সারা ভারত কিসান সভার সভাপতি পদ গ্রহণে তিনি অসম্মত হন।

সারাটা জীবন এইভাবে তিনি তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য দ্বারা চালিত হয়েছেন। এ ব্যাপারেও "লোকের ভালো করতে হবে" নিছক এই ধরনের একটা আবেগের দ্বারা তিনি চালিত হন নি, আবার "কি করে ভালো করা যায়" তা নিয়ে কূটতর্কেও মাতেন নি। তাঁর কাছে আবেগ এবং যুক্তিমত্তা, ভাবালুতা আর বৈজ্ঞানিক নির্লিপ্তি, সহানুভূতি এবং বিষয়মুখীতা সবই ছিল সামাজিক শান্তি ও সুখী মানবজীবন প্রতিষ্ঠার চরম লক্ষ্য অর্জনের পথ।

সুতরাং, প্রকৃতি-বিজ্ঞানী হিসাবে বা শেষে সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে, রাজনৈতিক কর্মী বা সমাজসেবী হিসেবে, বা শিক্ষাবিদ হিসাবে কতটা সাফল্য তিনি অর্জন করেছিলেন তা আমাদের কাছে বড়ো কথা নয়। অবশ্য এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান নগণ্য নয়। এ-সব বিষয়ে তাঁর রচনাবলী একত্র করলে বা তাঁর জীবনের ঘটনাগুলি পর পর সাজিয়ে যথাযথ জীবনকাহিনী রচনা করলেই তা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। তা আমাদের সমাজের পক্ষে খুবই শিক্ষণীয় হবে এবং প্রয়োজনীয় তো নিশ্চয়ই।

আমরা হয়তো সংকীর্ণ ক্ষেত্রে উজ্জ্বল কীর্তির তুলনায় বহুধাবিচিত্র কর্মপ্রয়াসকে ছোটো করে দেখতে পারি। চৌদ্দ ক্যারেট সোনার উজ্জ্বল দীপ্তি চোখ ধাধাঁয় কিন্তু খাঁটি সোনার দীপ্তি স্নিগ্ধই হয়। এই বিশেষীকরণের, বন্ধ্যা অতি-বিশেষীকরণের যুগে আমরা যদি বহুধাবিচিত্র কর্মপ্রয়াসকে ছোটো করে দেখি তাহলে তার পরিণামে ভুগতে হবে আমাদেরই এবং আমাদের সমাজকে। প্রগতির পথ ক্ষুরধার ও সর্বত্রগামী, কাদামাটির উপর কয়েকটি পালিশ করা পাথর বসিয়ে সে পথকে আস্তীর্ণ করা যায় না।

গত বছর রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে এক সেমিনারে ভাষণ দিতে গিয়ে নিজেকে তিনি সমাজকর্মী ও সমাজবিজ্ঞানী বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর কর্মধারায় বিশেষভাবে লক্ষণীয় তত্ত্ব ও কর্মের সুসমন্বয়।

নানা ধরনের কর্মে লিপ্ত থাকায় এবং নানা দায়-দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ায় অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়কে নানা লোকের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে। তাঁর প্রপিতামহ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশায় বলতেন, 'তুমি যদি কারো উপকার করে থাকো সে নিশ্চয়ই তোমার শত্রু হবে'। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয় নি, তিনিও বহু শত্রু তৈরি করেছিলেন। কিন্তু আমি যতদূর জানি তিনি কারুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন না, ব্যক্তিগত অপছন্দের জন্য কারোর প্রতি অবিচার করতেন না। কোনো লোক সম্পর্কে কঠোরতম যে মন্তব্য তিনি করতেন তা হল, 'লোকটা উৎসন্নে গেছে'। কারোর উপর খুব বেশি রেগে গেলে তাকে তিনি আহাম্মক বলতেন। অন্যদিকে তাঁর বন্ধু, পরিচিতবর্গ বা ছাত্রদের কাউকে একটা লক্ষ্য অনুসরণের চেষ্টা করতে দেখলে তাকে তিনি কথায় এবং কাজে অকৃপণ সাহায্য করতেন ও উৎসাহ দিতেন।

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় গল্পে মানুষ ছিলেন। তাঁর অনেক গল্প ছিল ব্যক্তিগত স্মৃতিরোমন্থন। কিন্তু তাই বলে তিনি আত্মকেন্দ্রিক মানুষ ছিলেন না, তিনি অপরের গুণকীর্তনেও অকৃপণ ছিলেন। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু (অ্যান্থ্রো-পলিজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর) ১৯২৪ সালে তাঁর প্রথম দলের ছাত্রদের অন্যতম। সারা জীবন তাঁর প্রতি তিনি বিশেষ স্নেহের ভাব পোষণ করতেন এবং তাঁর কৃতিত্বে গর্ব অনুভব করতেন। ডাঃ মীনেন্দ্রনাথ বসুর (বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের বর্তমান অধ্যক্ষ) প্রতিও তিনি অত্যন্ত সহৃদয়ভাব পোষণ করতেন। নাম অনেক করা যায়, কিন্তু তার স্থান নেই এখানে। আমি এখানে দুটি মাত্র নাম উল্লেখ করেছি কারোর প্রতি পক্ষপাত দেখাবার জন্য নয়, তাঁর মনোভাবের একটা উদাহরণ দেবার জন্যই।

তার চেয়েও বড়ো কথা হল, এই জ্ঞানের পরিধি বাড়াবার জন্য সর্বদা আগ্রহী হওয়ায় ছাত্রদের কাছ থেকে শিখতেও তিনি দ্বিধা করতেন না। এ ধরনের বহু দৃষ্টান্ত আমার জানা আছে যা তাঁর এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করবে 'ছাত্রের কাছ থেকে শেখা লজ্জার নয়, আনন্দের।' উক্তিটা অবশ্য নতুন নয়, কিন্তু কজনের কাছে তা cliche'র অধিক ?

জীবন সম্পর্কে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের যে মনোভঙ্গী গড়ে উঠেছিল এবং যে আদর্শ ধীরস্থিরভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে সারা জীবন তিনি অনুসরণ করে

গেছেন তার সামাজিক উৎস কী তা আমাদের জানা নেই। তাঁর জীবনে অদ্ভুত একটা পারিবারিক সমন্বয় গড়ে উঠেছিল—রামমোহন রায় তাঁর পিতার দিক থেকে উর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় মাতার দিক থেকে উর্ধ্বতন তৃতীয় পুরুষ আর তিনি বিবাহ করেছিলেন ঠাকুর পরিবারে। এই তিন পরিবারের ঐতিহ্য তাঁর চরিত্র গঠনে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে তা নিশ্চয়ই অনুসন্ধান করে দেখা দরকার।

এসব কথা বাদ দিলেও, যে সামাজিক ঐতিহ্য তাঁর কাছ থেকে আমরা পেয়েছি উত্তরাধিকার হিসাবে—উন্নততর সমাজের নির্মাণে আমরা তা গর্বের সঙ্গে অনুসরণ করতে পারি। আর এই তো ছিল তাঁর সারা জীবনের লক্ষ্য।

মহাকাশজয়ী মানুষ

১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর মানুষের এক বিরাট স্বপ্ন বাস্তবে রূপ লাভ করেছিল—পৃথিবীর আকাশ পেরিয়ে মহাকাশের নিকষ কালো রাজ্যে রুশ বিজ্ঞানীরা পাঠিয়েছিলেন প্রথম স্পুটনিক। তারপর কেটে গেছে ছ বছর। রুশ ও অ্যামেরিকান বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় এ পর্যন্ত শতাধিক স্পুটনিক মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছে। ঐ স্পুটনিকদের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতির কাছ থেকে আমরা পেয়েছি কত গুরুত্বপূর্ণ খবর—পৃথিবী, সূর্য ও মহাকাশ সম্বন্ধে। মানুষের বিজ্ঞানজগতে ধীরে ধীরে এক নবদিগন্ত উন্মুক্ত হতে চলেছে।

১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল শুরু হল মহাকাশজয়ের নতুন অধ্যায়। মহাকাশে পাড়ি জমালেন পৃথিবীর প্রথম মানুষ—ইউরি গাগারিন। তিনি এক ঘণ্টা ৪৮ মিনিটে পৃথিবীকে এক চক্কর ঘুরে নিরাপদে ফিরে এলেন স্বদেশভূমিতে। তারপর শুরু হল ক্রমপর্যায়ে রুশ ও অ্যামেরিকান মহাকাশযাত্রীদের পৃথিবী পরিক্রমা। প্রকৃতিজয়ী মানুষের শৌর্য ও বীর্যের কথা মহাকাশের অঙ্গনে ধ্বনিত হয়েছে যে চারণ কবিদের কণ্ঠে, তারা হলেন—ঘেরমান তিতফ (যাত্রা—৬ই আগস্ট '৬১, পৃথিবী পরিক্রমা ১৭ বার); জন গ্লেন (২০শে ফেব্রুয়ারী '৬২, ৩ বার), স্কট কার্পেণ্টার (২৪শে মে '৬২, ৩ বার), আন্দ্রিয়ান নিকোলায়েভ (১১ই থেকে ১৫ই আগস্ট '৬২, ৬৪ বার), প্যাভেল পপোভিচ (১২ই থেকে ১৫ই আগস্ট '৬২, ৪৮ বার), ওয়ালটার স্কীরা (৩রা নভেম্বর '৬২, ৬ বার), গর্ডন কুপার (১৫ই থেকে ১৭ই মে '৬৩, ২২ বার)।

যে জয়মাল্য প্রকৃতির কাছ থেকে মানুষ এভাবে ছিনিয়ে এনেছে, সম্প্রতি তাতে যুক্ত হয়েছে আর একটি মুক্তো। সেই মুক্তো আহরণ করেছেন একটি রুশ তরুণ ও একটি রুশ তরুণী। তরুণ—ভ্যালেরি বিকভস্কী, তরুণী—ভ্যালেন্টিনা তেরেশকোভা। ভ্যালেরী ও ভ্যালিয়া—একজনের বয়েস ২৮, আর একজনের ২৬—ছুটি ফুল।

পৃথিবীর প্রথম নারী ভ্যালিয়া মহাকাশযাত্রী হলেন। নারী যে অবলা নন, পুরুষের মতো অতি দুরূহ জটিল কাজে তিনিও যে সমান পারদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল। অন্যতমা নারীকে মহাকাশে পাঠিয়ে রুশ বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর সমগ্র নারী সমাজের অন্তরের কৃতজ্ঞতা অর্জন

করলেন। আর এই আশ্চর্য ঘটনার আকস্মিকতায় পৃথিবীর মানুষ অবাকবিস্ময়ে স্তম্ভিত হল, আনন্দে উৎফুল্ল হলো।

মহাকাশে দুজন :

পৃথিবীর জল, মাটি ও আকাশের উর্ধ্বে মহাকাশে ভ্যালেরীর যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৪ই জুন, ভারতীয় সময় বিকেল ৫-৩০ টাতে। দুই কোটি অশ্বশক্তিসম্পন্ন, একাধিক স্তরবিশিষ্ট এক মহাশক্তিমান রকেট ভ্যালেরির মহাকাশযান ভোস্তক-৫কে পৃথিবীর চতুর্দিকে এক নির্দিষ্ট কক্ষপথে প্রতিষ্ঠা করল। সম্ভবত এই যাত্রা শুরু হয়েছিল রুশিয়ার কাজাকস্থানের আরলসমুদ্র-তীরবর্তী বাইকোনুর নামে মহাকাশবন্দর থেকে।

ভ্যালেরির সাংকেতিক নাম ছিল 'হক' বা বাজপাখি। সসাগরা পৃথিবী একবার পরিক্রমা সম্পূর্ণ করতে ভোস্তক ৫-এর সময় লাগছিল ৮৮ মিনিট ৪ সেকেণ্ড; গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল, পৃথিবীর জমি থেকে মহাকাশযানের উপবৃত্তাকার কক্ষপথের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দূরত্ব ছিল যথাক্রমে ১১৪·৪ ও ১৪৫·৯ মাইল। ভূ-বিষুবরেখার সঙ্গে এই কক্ষপথের নতি ছিল ৬৫ ডিগ্রী।

ভ্যালেরির তেত্রিশ বারের মতো পৃথিবী পরিক্রমার পালা তখন সম্পূর্ণ হয়েছে। তার মহাকাশজীবনের নিঃসঙ্গতা পূরণের জন্যে সঙ্গিনী হলেন রুশ নারী তেরেশ্কোভা ভ্যালেন্টিনা (ভ্যালিয়া) ১৬ই জুন ভারতীয় সময় বিকেল ৩টে নাগাদ। ভ্যালিয়ার সাংকেতিক নাম ছিল 'সি-গাল'। (সি-গাল একটি আশ্চর্য পাখি; সমুদ্রের বুকে ঝোড়ো হাওয়া শুরু হলে এই পাখি হাওয়া ঠেলে সাগরের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলে।) এই দ্বৈত মহাকাশযাত্রা নতুন নয়। ১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে রুশ নাগরিক নিকোলায়েভ ও পপোভিচের সুদীর্ঘ দ্বৈত মহাকাশযাত্রার স্মৃতি পৃথিবীর মানুষের মনে এখনো উজ্জ্বল হয়ে আছে। কিন্তু বর্তমান মহাকাশযাত্রায় অন্যতম সদস্য পৃথিবীর একজন নারী।

মহাকাশযাত্রায় যোগ্যতার ছাড়পত্র ভ্যালিয়ার অবশ্যই ছিল। তিনি একজন নিপুণ বিমানচালিকা, বিমান থেকে প্যারাশুটে করে ঝাঁপিয়েছেন ১২৬ বার, এছাড়া সাঁতার, স্কি ইত্যাদি ক্রীড়ায় বিশেষ পারদর্শিনী। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মহাকাশযাত্রার ক্ষেত্রে দৈহিক বলের চেয়ে দৈহিক সামর্থ্যের প্রয়োজন বেশি। তারা বহুবিধ বিস্তৃত জীববৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার

মাধ্যমে দেখেছেন নারী পুরুষের মতই সর্ববিধ দৈহিক ক্লেশ সহ্য করতে সক্ষম। ভ্যালিয়ার ব্যক্তিগত ক্ষমতাবলীর কথা মনে রেখেই বিজ্ঞানীরা তার নির্বাচনে উৎসাহিত বোধ করেছিলেন। ভ্যালিয়ার শিক্ষাবিধি একজন পুরুষ মহাকাশযাত্রীর মতই সম্পূর্ণাঙ্গ ছিল।

ভ্যালিয়ার একবার পৃথিবী পরিক্রমার সময় ছিল ৮৮·৩ মিনিট, ভ্যালেরির তুলনায় ৬ সেকেণ্ড কম, গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় ১৮,০০০ মাইল এবং পৃথিবী থেকে তার কক্ষপথের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ দূরত্ব ছিল যথাক্রমে ১১৩ ও ১৪৪ মাইল।

এই দ্বৈত মহাকাশযাত্রার বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য ছিল, জীবদেহের ওপর মহাকাশের বিবিধ ঘটনার যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে তার গবেষণা, পুরুষ ও নারীর দেহে এই প্রতিক্রিয়ার তারতম্যের বিচার, চিকিৎসা ও জীববৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে নতুন তথ্যানুসন্ধান এবং একাধিক মহাকাশযানের এককালীন মহাকাশযাত্রায় যান্ত্রিক পরিচালন-ব্যবস্থার উন্নতিসাধন।

ভ্যালিয়া তার প্রথম পৃথিবী পরিক্রমার সময় ভ্যালেরির মহাকাশযানের তিন মাইলের মধ্যে এসে পড়েছিলেন। (ইতিপূর্বে নিকোলায়েভ ও পপোভিচের দ্বৈত মহাকাশযাত্রায় এই দূরত্বের পরিমাণ ছিল ৪ মাইল।) মহাকাশে পাড়ি জমানোর সঙ্গে সঙ্গেই ভ্যালিয়া ভ্যালেরির সঙ্গে বেতার-যোগাযোগ স্থাপন করেন। দুয়ের মহাকাশজীবনের নিঃসঙ্গতা দুয়ের হৃদয়ের উত্তাপের স্পর্শে নিশ্চয়ই পরম রমনীয় হয়ে উঠেছিল।

পৃথিবীর বাইরে :

মহাশক্তিমান রকেট ভ্যালেরি ও ভ্যালিয়াকে যে অঞ্চলে পৌঁছে দিল, আক্ষরিক অর্থে তাকে হয়তো মহাকাশ বলা যায় না। পৃথিবীকে ঘিরে বায়ুমণ্ডলের যে আবরণ, জমির ওপর তার ঘনত্ব ও চাপ জীবদেহের পক্ষে পরম অনুকূল। কিন্তু পৃথিবী থেকে যত দূরে যাওয়া যাবে, ততোই বায়ু হয়ে আসে তনু থেকে আরো তনু। বায়ুর মোট পরিমাণের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগই রয়েছে তার প্রথম সাড়ে চার মাইলের মধ্যে এবং মানুষের বাঁচবার ক্ষমতাও এই এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তার বাইরে কৃত্রিম অক্সিজেন ছাড়া চলবার উপায় নেই।

অতিতনুর পর্যায়ে হলেও পৃথিবীর ২৫০ মাইল দূর পর্যন্ত বায়ুর ছিটেফোঁটা পাওয়া যায়। এর ওপারেও যে বায়ু নেই, তা নয়, তবে তাকে হিসেবের

মধ্যে ধরা হয় না। এই ২৫০ মাইল অঞ্চলটুকুর নাম দেওয়া হয়েছে আকাশ এবং সেই আকাশকে ছাড়িয়ে যে সীমাহীন অনন্ত এলাকা—তাই হলো স্পেস, বাংলায় বলতে পারি মহাকাশ।

এই মহাকাশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন প্রাণঘাতী রশ্মির সর্বনাশা প্রকৃতি, যেমন সূর্যদেহনিঃসৃত রঞ্জনরশ্মি, অতিবেগুনীরশ্মি, সৌরকণিকাস্রোত ও মহাকাশের গহন অভ্যন্তরে জাত মহাজাগতিক রশ্মি। বায়ুর ঘনস্তরগুলি রক্ষীদুর্গের মতো এদের সংঘাত থেকে আমাদের জীবদেহকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করে চলেছে। এরা পৃথিবীর জমির দিকে নামতে গিয়ে বায়ুকণিকার সঙ্গে সংঘাতে দুর্বল হতে থাকে; অবশিষ্ট মারাত্মক চরিত্রটুকু শোষণ করে নেয় পৃথিবীর পনের থেকে কুড়ি মাইল দূরে বায়ুর ওজোন গ্যাসের মণ্ডল। এই মণ্ডলের বাইরে এলেই জীবদেহ মহাকাশরশ্মিদের শিকারে পরিণত হয়ে বসবে।

ভ্যালেরি ও ভ্যালিয়ার পরিক্রমাঅঞ্চলে এই মৃত্যুদূতের দল ছিল ওঁত পেতে, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা দুটি মহাকাশযানেই ছিল।

রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধময় এই মাতা-পৃথিবী—মানুষ যেন তার সঙ্গে এক নিবিড় বাঁধনে বাঁধা। ভ্যালেরি ও ভ্যালিয়ার বাহক রকেটের গতি পৃথিবী থেকে যাত্রার ছ-সাত মিনিটের মধ্যেই শূন্যের কোঠা থেকে ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইলের অঙ্কে এসে পৌঁছোয়। এই দ্রুত ত্বরণের (acceleration) ফলে রকেটযাত্রী মানুষের দেহের স্বাভাবিক ওজন আট থেকে ন-গুণ বেড়ে উঠতে পারে। ফলে মনে হবে, ঐ পরিমাণ একটি বোঝা যেন বুকের ওপর চেপে বসেছে। চার, পাঁচ মিনিটের বেশি এ অবস্থা স্থায়ী হলে প্রথমে শ্বাসকষ্ট, বুকব্যথা এবং ক্রমে মাথায় রক্তসঞ্চালন কমে গিয়ে দৃষ্টিশক্তি ও চেতনা লোপ পেয়ে বসে। চিত হয়ে শোয়া অবস্থায় এ প্রভাবের তীব্রতা অনেক বেশি সময় সহ্য করা যায়। ভ্যালিয়ার ক্ষেত্রে এই ত্বরণের সমস্যা নিয়ে রুশ বিজ্ঞানীরা বোধহয় খানিকটা চিন্তিত ছিলেন, কিন্তু ভ্যালিয়া সসম্মানে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

ওজন নেই :

মহাকাশযানের যাত্রাকালীন কর্ণবিদারী প্রচণ্ড শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে এল। ছ-সাত মিনিটের মধ্যে বাহক-রকেটের স্তরগুলো তাদের কাজ শেষ করে

একটির পর একটি খসে পড়ল পৃথিবীর দিকে। এঞ্জিনের কাজ এখন বন্ধ হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে একি আশ্চর্য অনুভূতি! শরীরটা যেন পালখের চেয়েও হালকা হয়ে গেছে। ইচ্ছে করলেই দিব্যি ঘরময় ঘুরে বেড়ানো যায়। ওজনটা ভোজবাজীর মতো কোথায় লোপাট হল? পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণরূপী বলের এলাকার বাইরে চলে এসেছে কি ভ্যালেরি ও ভ্যালিয়া? ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। পৃথিবী থেকে যে দূরত্বে ওরা রয়েছে, সেখানে মাধ্যাকর্ষণের টান শতকরা দু-ভাগের চেয়ে বেশি কম হবার কথা নয়, কিন্তু থেকেও কোনো কারিজুরী খাটাতে পারছে না কারণ তার নিচু টানকে কাটিয়ে দিচ্ছে আর একটি বল—মহাকাশযানের সম্মুখপানে ঘটায় ১৮০০০ মাইলের প্রচণ্ড ছুট। ফলে অবাধ পতনের মাঝে মহাকাশযানের পথ হবে তৈরি। পৃথিবী থেকে অনেক দূরে বলে সেই পতনের পথটা পৃথিবীর চারদিকে, তার জমিটাকে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে, মহাকাশের বুকে। বাধা-বন্ধহীনভাবে পতনশীল কোনো বস্তুরই ওজনের অনুভূতি থাকে না, তাই মহাকাশযানের সঙ্গে তার ভেতরকার সর্ববস্তুও আপন আপন ওজনকে হারিয়ে বসবে।

ওজনবিহীন অবস্থায় ভ্যালেরি ও ভ্যালিয়াকে নানা বিচিত্র পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে জল বা খাবার খাওয়ার উপায় তাদের ছিল না। নিচুটান নেই, ফলে গ্লাসভর্তি জল উপুড় করে ধরলেও একফোঁটা জল গলা দিয়ে গড়াবে না। উপায় কি? বোতলে পুরে বা খড় দিয়ে টেনে খাওয়া চলতে পারে। ভ্যালেরি ও ভ্যালিয়া তাদের নিজের নিজের পছন্দমতো জল সঙ্গে নিয়েছিলেন। জীবাণু ধ্বংস করার জন্যে জলকে রাসায়নিকভাবে পরিশুদ্ধ করে নিয়ে তার সঙ্গে খানিকটা রূপো মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল টাটকা রাখার জন্যে। যে সব পাত্রের মধ্যে এই জল ভরা থাকে, জোরালো চাপে তাদের কোনো ক্ষতি হয় না। বোতাম টিপলেই জল রবারের নলের ভেতর দিয়ে মুখের সামনে রাখা একটি 'মাউথপিসে' হাজির হয়ে যাবে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবার জন্যে ভ্যালেরি ও ভ্যালিয়া তোয়ালের জায়গায় বিশেষ ধরনের কাপড় (cheesecloth) ব্যবহার করেছিলেন। এই কাপড় এমন একটি তরল পদার্থে ভেজানো, যাকে দিয়ে জল ও সাবানের কাজ দুইই চলতে পারে। ভবিষ্যৎ মহাকাশযানে তিন কি চার লিটার

(প্রায় এক গ্যালন) জলে স্নানের ব্যবস্থা করার জন্যে রুশ বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন।

ওজনবিহীন অবস্থায় দাঁত বুরুশ করা বড় মুস্কিলের ব্যাপার। তাই রুশ বিজ্ঞানীরা সুগন্ধযুক্ত এক বিশেষ ধরনের টুথপেস্ট আবিষ্কার করেছেন, যাকে দিব্যি খেয়ে ফেলা যায়। মহাকাশযাত্রী ঐ টুথপেস্ট মুখে পুরে ভাল করে কুলকুচি করে গিলে ফেলবেন—দাঁত দিব্যি পরিষ্কার ঝকঝকে থাকবে।

মহাকাশযানে প্লেটভর্তি খাবার সাজিয়ে বসলে চলবে না। হাত বা চামচের ঠেলায় খাবার জিনিস প্লেট থেকে ছিটকে বেরিয়ে ছুট শুরু করে দিতে পারে। ইতিপূর্বে মহাকাশযাত্রীরা খাবার জিনিস পেস্টের মতো পাতলা করে, টিউবে পুরে টিপে টিপে খেতেন। বর্তমানে তারা সাধারণ খাদ্যও সঙ্গে নিতে পারেন। ভ্যালেরি ও ভ্যালিয়া দিনে চারবার করে খেয়েছেন। মাংসজাত নানাবিধ খাদ্য তাদের মেনুর অন্তর্ভুক্ত ছিল; এছাড়া ছিল টাটকা কমলালেবু, লেবু, আপেল, ফলের রস ও বিশেষভাবে তৈরি বিস্কুট, চকোলেট জাতীয় জিনিস। খাবার জিনিসগুলো ছোট ছোট টুকরো করে কাটা ছিল, যাতে খেতে কোনো অসুবিধে না হয় এবং এদের ভরে রাখা হতো সেলোফেন-পলিথিলিনের তৈরি ব্যাগে।

খাবারের সঙ্গে যুক্ত ছিল নানাবিধ ভিটামিন। ভিটামিনের কাজ শুধু শরীরের পুষ্টির চাহিদা মেটানো নয়, কখনো স্নায়বিক উত্তেজনায় মহাকাশ-যাত্রীর শারীরব্যবস্থায় অস্বাভাবিক কোনো পরিবর্তন দেখা দিলে তাকেও স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরিয়ে আনা।

স্নায়বিক উত্তেজনা স্নেহজাতীয় পদার্থের প্রয়োজনকে বাড়িয়ে তোলে। তাই ভ্যালেরি ও ভ্যালিয়ার খাদ্যে চর্বির তুলনায় স্নেহের উপাদান ছিল বেশি এবং এ্যালবুমেনের (ডিমের শাদা অংশ) মাত্রা ছিল শতকরা সতের ভাগ।

ওজনবিহীন অবস্থায় ঘুমোনোর জন্যে ভ্যালেরি বা ভ্যালিয়ার কোনো খাট পালংকের দরকার ছিল না। তারা ঘরের মধ্যে দিব্যি হাত-পা ভাসিয়ে ঘুমোতে পারতেন। কিন্তু সেই অবস্থায় নাক দিয়ে নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসা কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাষ্পের ধারা একটি বিপদ সৃষ্টি করে বসত। গ্যাস বেরিয়ে এসে একদিকে ধাক্কার সৃষ্টি করছে, ফলে বিপরীত দিকের

প্রতিধাক্কায় মহাকাশযাত্রীদের দেহ ভাসতে ভাসতে গিয়ে উলটো দিকের দেয়ালে মাথাটা বেশ জোরে ঠুকে যেত। কাজেই ভ্যালেরি বা ভ্যালিয়াকে তাদের নিজেদের আসনের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে ঘুমোতে হয়েছিল। অবশ্য তারা দুজনেই মাঝে মাঝে হাত-পা ছেড়ে ঘরের মধ্যে ভেসে বেড়িয়েছেন। ভ্যালেরি তার টেলিভিসন দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্যে কিছুটা জল ঘরের মধ্যে ঢেলে সেটা কিভাবে মাঝশূন্যে দিব্যি ঘুরে বেড়ায়, সে ম্যাজিকও দেখিয়েছেন।

স্বয়ংক্রিয় জগৎ

ভ্যালেরি ও ভ্যালিয়ার মহাকাশযান দুটির অভ্যন্তরে জীবদেহের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রতিটি ব্যবস্থার সুষ্ঠু আয়োজন ছিল।

ভ্যালেরি ও ভ্যালিয়ার কক্ষের তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ১৬ ও ২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, বাতাসের চাপ ছিল পারদের মাত্রায় ৭৫৪ ও ৭৮০ মিলিমিটার এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে শতকরা ৬০ ও ৩৪ ভাগ।

ওজনবিহীন অবস্থায় প্রয়োজনীয় অক্সিজেনকে সংগ্রহশালা থেকে মহাকাশ-কক্ষে সরবরাহ করা ও দেহনির্গত জলীয় বাষ্পকে ঠেলে বাইরে পাঠানোর জন্যে জোরালোভাবে বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা (Forced air circulation) ছিল। নিঃশ্বাসের সঙ্গে নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাষ্প শোষণের জন্যেও বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।

ভ্যালেরি ও ভ্যালিয়ার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় নানা সূক্ষ্ম জ্ঞানদা যন্ত্র (sensor apparatus) বসানো ছিল। প্রতিমুহূর্তে ঐ সব যন্ত্র দুজনের জীববৈজ্ঞানিক নানা তথ্যকে বেতারতরঙ্গে রূপান্তরিত করে রুশ বিজ্ঞানীদের কাছে পাঠিয়েছে।

মহাকাশ-পরিক্রমাকালীন অবস্থায় ভ্যালেরি ও ভ্যালিয়ার নাড়ীর স্পন্দন-বেগ ছিল প্রতি মিনিটে যথাক্রমে ৬০ থেকে ৬৫ বার ও ৮০ বার। দুজনের শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি ছিল মিনিটে যথাক্রমে ১৭ থেকে ২০বার ও ২৫ বার। নিদ্রিত অবস্থায় ভ্যালিয়ার নাড়ীর গতি ছিল মিনিটে ৫২ থেকে ৫৪ বার। দুজনের হৃদযন্ত্রের ক্রমিক স্পন্দনের (electro-cardiogram) মাঝে কোনো বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নি। তাদের Vestibular apparatus-এর স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি, যেমন হয়েছিল দ্বিতীয় রুশ মহাকাশযাত্রী

তিতফের ক্ষেত্রে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাঝে অবস্থিত এই অংশটির কাজ হচ্ছে—মাথার অবস্থানের সামান্যতম পরিবর্তনের সংবাদ মস্তিষ্ককে জ্ঞাপন করা।

মহাকাশের বুকে পৃথিবী

পৃথিবীর দেড় শ মাইল ওপরে মহাকাশের রং নিকষ কালো। এই উচ্চতায় বায়ুকণিকাদের সংখ্যা এত নগণ্য যে তারা সাতরঙ্গা সূর্যের আলোর ছটা রংকে শুষে নিয়ে নীল রংটাকে আর ছড়িয়ে দিতে পারে না। ভ্যালেরি ও ভ্যালিয়ার মহাকাশজীবনে প্রতি দেড় ঘণ্টায় একটি করে দিন ও একটি করে রাত্রি আবর্তিত হচ্ছিল। সূর্যের আলোকে আড়াল করার জন্মে পৃথিবীর পেছনে এক বিরাট কালো ছায়া লক্ষ লক্ষ মাইল বিস্তৃত হয়ে আছে। মহাকাশযানেরা সেই ছায়ার রাজ্যে প্রবেশমাত্রেই রাত্রি তাদের গ্রাস করছিল।

ভ্যালিয়া নিকষ কালো মহাকাশের বুকে পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্যে উচ্ছ্বসিতা হয়ে উঠেছিলেন। প্রায় দেড়শ মাইল ওপর দিয়ে যাবার ফলে পৃথিবীর মহাদেশের সীমানা, নদী, পর্বত ও নগরাদি তারা দুজনেই পরিষ্কার চিনতে পারছিলেন। বায়ুহীন নিকষ কালো মহাকাশের বুকে নক্ষত্রের দীপাবলী ছিল অনেক বেশি উজ্জ্বল।

এবারে ফেরার পালা। ভ্যালেরি ৪ দিন ২৩ ঘণ্টা ৫৪ মিনিটে (প্রায় ১২০ ঘণ্টা) ৮২ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণের পর ১৯শে জুন ভারতীয় সময় বিকেল ৪-৩০টে নাগাদ মধ্য এশিয়ার এক পূর্ব-নির্দিষ্ট স্থানে এসে নিরাপদে অবতরণ করলেন। মহাকাশে এত সুদীর্ঘ সময় ইতিপূর্বে আর কেউ যাপন করেন নি। তিনি মোট পথ অতিক্রম করেছিলেন ২০,৬০,০০০ মাইল।

২ দিন ২২ ঘণ্টা ৫০ মিনিটে (৭১ ঘণ্টা) পৃথিবীকে ৪৮ বার পরিক্রমা সম্পূর্ণ করে ভ্যালিয়া ১৯শে জুন ভারতীয় সময় দুপুর ১-৩০টা নাগাদ ভ্যালেরির অবতরণ ক্ষেত্রের কয়েক মাইল দূরে প্যারাসুটের সাহায্যে অবতরণ করেন। মহাকাশযানটি কাছেই নিরাপদে অবতরণ করে। ভ্যালিয়া মোট পথ অতিক্রম করেছিলেন ১২,৫০,০০০ মাইল।

রুশ বিজ্ঞানীদের এবং সমগ্র পৃথিবীর মানুষের সুদীর্ঘ সঞ্চিত উৎকণ্ঠার আনন্দপূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটল।

শঙ্কর চক্রবর্তী

বিবেকের জন্ম

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলে—যেখানে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে নিগ্রো বিদ্বেষ সবচেয়ে মজ্জাগত সেখানকার একটি অঙ্গরাজ্য আলাবামা। এই আলবামা আজ পৃথিবী জুড়ে খবরের কাগজে রক্তাক্ত হেড লাইন। এখানকার বার্মিংহাম শহরের পুলিস আর শ্বেতাঙ্গ সাধারণ লাঠি-গুলি-হোসপাইপ চালিয়ে, কুকুর লেলিয়ে দিয়ে, কালা মানুষের রক্তে মাটি ভিজিয়েছে।

এই আলাবামারই একটি ছোট মফঃস্বল শহর মেকুম্ব কাউন্টি—হয়তো বার্মিংহামের মতোই। ১৯৩৫-৩৬-এ এই মেকুম্ব ছিল, "ক্লান্ত আর পুরনো একটি শহর। বর্ষাকালে এর পথগুলো ভরে যায় লালচে কাদায়, রাস্তার দুই পাশে গজায় ঘাস, নড়বড়ে আদালত-বাড়িটা মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে ভেজে। ঢিমে তালে চলাফেরা করে লোকজন—দিনগুলো যেন চব্বিশ ঘণ্টার চেয়ে দীর্ঘতর। দোকান ঘরগুলোয় লোকে ঢুকছে বেরুচ্ছে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে নিয়ে। কোনো কিছুতেই তাড়া নেই, কারণ যাবার নেই কোথাও, কেনার নেই কিছু, নেই কেনার মত টাকাও। মেকুম্ব কাউন্টির সীমানার বাইরে কোথাও কিছু দেখার নেই।"—কিন্তু এইরকম একটি বিবর্ণ শহরের ভোঁতা জীবনে বিবেকবুদ্ধির জাগরণ সম্পর্কে হার্পার লী যে-উপন্যাসটি লিখেছেন, তাকে সাম্প্রতিক মার্কিণ সাহিত্যে একটি স্মরণীয় রচনা বলতে দ্বিধা নেই।

১৯৬০ সালের পুলিটজার পুরস্কার পাওয়া শ্রীমতী লী-র এই প্রথম উপন্যাস 'টু কিল এ মকিং বার্ড' শ্বেতাঙ্গ মার্কিনের মজ্জাগত নিগ্রোবিদ্বেষের স্বরূপ ও সমস্যাটিকে তুলে ধরেছে একটি ছোট্ট মেয়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এই সমস্যাটিকে কাহিনীর কেন্দ্রে রেখে লেখিকা ছ-বছর বয়সী দুরন্ত মেয়ে জীন লুইসের (ডাক নাম 'স্কাউট') শৈশব জীবনের নানা ঘটনার, নানা অ্যাডভেঞ্চারের, জাল বুনেছেন অপূর্ব কাব্যরসসিঞ্চিত বর্ণনার মধ্যে দিয়ে। বাচ্চা মেয়ে স্কাউটের শিশুসুলভ উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে যুদ্ধপূর্বকালের এক মার্কিন মফঃস্বল শহরের সমাজজীবন চিত্রণে, চরিত্রগুলিকে উজ্জ্বল রঙে ফুটিয়ে তোলার মুন্সিয়ানায় এবং শিশুমনের কৌতুক-কৌতূহলে ভরা রচনার কাব্যগুণে হার্পার লী-র এই উপন্যাসটি অনেক জায়গাতেই মার্ক টোয়েনের 'হাক্‌ল্‌বেরি ফীন্'-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে, শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের নিগ্রো-বিদ্বেষ যে

কতোখানি বদ্ধমূল, সেটাকে ফুটিয়ে তোলার দিক থেকে হার্পার লী-র এই উপন্যাস অনেকাংশে মনে করিয়ে দেয় সিন্‌ক্লেয়ার লুইসের 'কিংসব্লাড রয়্যাল'-এর কথা।

গল্পের যখন শুরু, তখন স্কাউটের বয়েস ছয় আর তার দাদা জেম-এর বয়েস দশ। স্কাউটের দু বছর বয়সে মা মারা গেছেন, সংসার চালায় নিগ্রো রাঁধুনী ক্যাল্‌পর্নিয়া! তাদের বাবা অ্যাটিকাস কিন্তু স্থানীয় আদালতের আইনজীবী —শান্ত, দৃঢ়, বিবেকবান আর ঢিলেঢালা স্বভাবের এই চরিত্রটিকে তার ছ বছর বয়সী মেয়ের দৃষ্টি থেকে লেখিকা উজ্জ্বল রেখায় চিত্রিত করেছেন। ছেলে-মেয়েদের প্রতি অ্যাটিকাসের ব্যবহার অনেকটা বন্ধুর মতো। সস্নেহ শাসন আছে, প্রশ্রয় নেই। জেম আর স্কাউটের আরেক বন্ধু ছিল। এই তিনটি ছেলেমেয়েকে রহস্যের এক অদম্য আকর্ষণে টানে প্রতিবেশী র‍্যাডলিদের বাড়িটা—যে বাড়ির দরজা-জানলা সব সময়ে বন্ধ থাকে, বৃদ্ধ বার্কার র‍্যাডলি ছাড়া আর কাউকে যে-বাড়ি থেকে বেরুতে বা ঢুকতে দেখা যায় না। বার্কারের ভাই আর্থার "বু" র‍্যাডলি এই জানলা-বন্ধ বাড়িতে বন্দীজীবন যাপন করছে আজ একটানা পনের বছর ধরে। পনের বছর আগে তরুণ "বু" র‍্যাডলি দলে পড়ে মাতাল হয়ে এক গুণ্ডামীর ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে তার পরিবারের মুখে চুণকালি মাখিয়েছিল বলে তার এই অবস্থা। পনের বছরের মধ্যে তাকে কেউ দেখে নি, তাকে নিয়ে শহরে নানা কিংবদন্তী। শহরের প্রত্যেকটি শিশু জানে—দশ ফুট লম্বা "বু" র‍্যাডলি মূলোর মতো হলদে দাঁত দিয়ে জ্যান্ত কাঠবেড়ালী ধরে ধরে চিবিয়ে খায়, সে ভস্মলোচন—তার দৃষ্টিপাতে মানুষের শরীর শুকিয়ে যায়। এহেন "বু" র‍্যাডলিকে একবার দেখার জন্যে জেম, স্কাউট আর ডিলের চলে নানা অ্যাডভেঞ্চার-অভিযান। ইস্কুল থেকে ফেরার পথে মাঝে মাঝে র‍্যাডলি বাড়ির সামনে একটা গাছের কোটরে জেম আর স্কাউট নানা জিনিস খুঁজে পায়—চিউয়িং গাম, চকোলেট, একটা পুরনো ঘড়ি, সাবান কেটে তৈরি একজোড়া ছেলেমেয়ের মূর্তি, পুরনো মুদ্রা, নকল মুক্তার মালা ইত্যাদি—যেন তাদেরই জন্যে কেউ উপহার রেখে গেছে। সদা বিরক্ত বার্কার র‍্যাডলি একদিন এসে গাছের সেই কোটরটি সিমেণ্ট দিয়ে বন্ধ করে দেন।

"বু" র‍্যাডলিকে কোনোরকমে বাড়ির বাইরে বের করে এনে তাকে একবার দেখার জন্যে যখন জেম স্কাউট আর ডিলের নানা পরিকল্পনা একের

পর এক ব্যর্থ হচ্ছে, তখন মেকুম্ব কাউন্টির নিস্তরঙ্গ জীবনে এক প্রবল আলোড়ন জেগেছে: নিগ্রো টম রবিনসন শ্বেতাঙ্গিনী মেয়েলা ইউয়েলকে ধর্ষণ করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে আর টমের পক্ষ সমর্থন করছে অ্যাটিকাস ফিঞ্চ! ফিঞ্চের ওপরে নেমে এসেছে শ্বেতাঙ্গ সমাজের ঘৃণা ক্রোধ আর অপমানের প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি। "নিগার-প্রেমিক"-এর ছেলেমেয়ে বলে জেম আর স্কাউটকে বড়োদের আর সমবয়সীদের হাতে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হচ্ছে—শুধু শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকেই নয়; ক্যাল্‌পর্নিয়ার সঙ্গে একদিন নিগ্রোদের গীর্জায় গিয়ে নিগ্রোদের একাংশের কাছেও তারা অপমানিত হল শ্বেতাঙ্গ সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে। অ্যাটিকাসের প্রতি শ্বেতাঙ্গ সমাজের বিদ্বেষ আরেও বাড়ল যখন শহর-ভেঙে-পড়া আদালত ঘরে সে সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণ করে দিল যে কুরূপা মেয়েলা ইউয়েলেরই এক জঘন্য অপরাধকে চাপা দেবার জন্যে তার বাবা বব ইউয়েল নিরপরাধ টমের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ সাজিয়েছে। কিন্তু তবু, শ্বেতাঙ্গ জুরির দল টমকে দোষী বলে ঘোষণা করতে একটুও দ্বিধা করল না। বব ইউয়েল প্রকাশ্যেই অ্যাটিকাসের মুখে থুতু ছিটিয়ে ঘোষণা করল—এর জন্যে তাকে কঠিন মূল্য দিতে হবে। অনেক চেষ্টায় অ্যাটিকাস যখন টমের পক্ষে আপীলের আবেদন আদায় করল, তখন শ্বেতাঙ্গ বিচারকদের কাছে ন্যায়বিচার পাবার কোনো আশা নেই দেখে দিশেহারা টম পুলিশের হেফাজত থেকে পালাতে গিয়ে গুলিতে প্রাণ দিল।

আর, তারপর থেকে একটু একটু করে হাওয়া ঢুকতে শুরু করল মেকুম্ব কাউন্টির রুদ্ধদ্বার-জীবনে। ধীরে ধীরে শুরু হল বিবেকবুদ্ধির জন্ম। অ্যাটিকাসের ওপরে প্রতিশোধ নেবার জন্যে এক অন্ধকার রাত্রে বব ইউয়েল যখন জেম আর স্কাউটকে খুন করতে এগিয়ে এল র‍্যাডলি-বাড়ির পেছনের বাগানে, ঠিক সেই সময়ে বেরিয়ে এল "বু" র‍্যাডলি—স্কাউট আর জেমকে বাঁচানোর জন্যে বব ইউয়েলকে হত্যা করা ছাড়া তার কোনো উপায় ছিল না।

বিবেকের সংক্রমণ শুরু হয় এক মন থেকে আরেক মনে। শহরের শেরিফ হেক টেট—যে টম রবিনসনের বিরুদ্ধে অম্লানবদনে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল—সে এগিয়ে আসে "বু"-কে নিরপরাধ বলে প্রমাণ করার চেষ্টায়। যারা অ্যাটিকাসকে গাল পেড়েছে 'নিগার লাভার' বলে, তাদের অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে—টম রবিনসনের মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্যে দায়ী কে? প্রশ্ন সঞ্চারিত হয় এক মন থেকে আরেক মনে।

দরজা-জানালা-বন্ধ র‍্যাডলি-বাড়িটা যেন মেকুম্ব কাউন্টির গণ্ডীঘেরা জীবনের প্রতীক ; আর, পনের বছর একটানা বন্দী থাকার পর এক চরম মুহূর্তে "বু" র‍্যাডলির হঠাৎ বেরিয়ে আসাটা যেন মেকুম্বের বাসিন্দাদের মনে সংস্কার-ভাঙা এক চেতনার আবির্ভাবের প্রতীক। শিশু স্কাউট আর জেমের মনে যে জিজ্ঞাসা জেগেছে, সেই জিজ্ঞাসাকে 'বু' র‍্যাডলি জীইয়ে রাখতে চায়। গাছের কোটরে সেই উপহারগুলি তাদেরই সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাবার জন্যে সে রেখে যেত।

সিনেমায় 'টু কিল এ মকিং বার্ড'-এর* চিত্রনাট্যকার হর্টন ফুট ও পরিচালক রবার্ট মুলিগ্যান যে সংযম, সুরুচি ও শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছেন, তা সমকালীন মার্কিন চলচ্চিত্রে রীতিমত বিরল। স্বভাবতই, উপন্যাসের অনেক ঘটনাকে সিনেমায় বাদ দিয়ে তার মূল গল্পটির ওপরেই দর্শকের মনোযোগকে সংহত করা হয়েছে। ফলে, স্কাউট তার শিশুদৃষ্টিতে দেখা মেকুম্বের সমাজজীবনের যে-খণ্ডচিত্রগুলি এঁকেছে, তার অনেকখানিই সিনেমায় অনুপস্থিত। তবু, উপন্যাসের মূল বক্তব্যটিকে যে মোটের ওপর সততার সঙ্গে সিনেমায় উপস্থিত করা হয়েছে, তার জন্যে রবার্ট মুলিগ্যানকে সাধুবাদ দিতে আমরা বাধ্য—অন্তত এই একটি কারণে যে এরকম একটি বিষয়কে তিনি আজকের দিনে তাঁর ছবির উপাদান হিসেবে বেছে নিয়েছেন সাহস করে।

ছবিটি ১৯৬২ সালের তিনটি অ্যাকাডেমি-পুরস্কার পেয়েছে : বছরের শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যের জন্যে হর্টন ফুট ; শ্রেষ্ঠ শিল্প-নির্দেশনার জন্যে আলেকজাণ্ডার গলিট্‌জেন ও হেনরি ব্যাম্‌স্টিড ; এবং অ্যাটিকাস ফিঞ্চের ভূমিকায় বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে গ্রেগরি পেক। অ্যাটিকাসের সংযত, আদর্শবাদী ব্যক্তিত্ব ও দীর্ঘসূত্রী ঢিলেঢালা স্বভাবকে গ্রেগরি পেক সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—যদিও কোনো কোনো জায়গায় তিনি তাঁর মুদ্রাদোষগুলিকে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। টমের ভূমিকায় তরুণ নিগ্রো অভিনেতা ব্রক পিটার্স্, আর জীবনের স্বাদ থেকে চিরবঞ্চিতা কুরূপা মেয়েলা ইউয়েলের ভূমিকায় ভার্জিনিয়া ক্যাল্‌বার্ট মর্মস্পর্শী অভিনয় করেছেন।

কিন্তু এদের সবাইকে ম্লান করে দিয়েছে তিনটি আশ্চর্য শিশু-অভিনেতা—মেরী ব্যাডহাম (স্কাউট), ফিলিপ অ্যাল্‌ফোর্ড (জেম) আর জন মেগ্‌না (ডিল)। এদের অভিনয় এতই সহজ ও সাবলীল যে এরা আদৌ অভিনয় করছে বলেই মনে হয় না। বিশেষ করে স্কাউট-রূপী মেরী ব্যাডহামের অভিনয় দেখে বার বার মনে হল, সে খুব অল্প দিনের মধ্যেই সেযুগের শার্লি টেম্প্‌ল্-এর মতো বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা অর্জন করবে।

রবীন্দ্র মজুমদার

* স্থানীয় মেট্রো সিনেমাগৃহে ৬ই জুন থেকে দু' সপ্তাহের জন্যে প্রদর্শিত।

ব্রিটিশ ছবির ইতিহাস

বিচ্ছিন্নভাবে যে কোনো দেশে যে কোনো কালে প্রস্তুত একটি উৎকৃষ্ট ছবি যে কোনো সময়ে দেখে আমরা উপভোগ করতে পারি, কিন্তু একটি দেশের সামগ্রিক চলচ্চিত্র কর্মের বিকাশ ও পরিণতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে হলে, সেই শিল্পকর্মে সে দেশের জাতীয় মানস কিভাবে প্রতিফলিত এ-সম্পর্কে অবহিত হতে হলে সে দেশের চলচ্চিত্রের ধারাবাহিক পরিচয় দরকার হয়। ফরাসী চলচ্চিত্রশিল্পের আগু পিছু না জেনেও আমরা "হিরোশিমা মন্ আমুর" কিংবা "লা ওমুর সে লেত্"-এর মত উৎকৃষ্ট ছবি উপভোগ করতে পারি। কিন্তু ফরাসী চলচ্চিত্র সম্পর্কে সামগ্রিক জ্ঞান অর্জন করতে হলে আদি যুগ থেকে আজকের দিনের ক্রফো রেণে গর্দাদ-এর ছবির সঙ্গে ধারাবাহিক ও চাক্ষুষ পরিচয় থাকা দরকার। সম্প্রতি ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি লণ্ডনের ব্রিটিশ ফিল্ম ইন্‌স্টিটিউট এবং এখানকার ব্রিটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসের সহযোগিতায় দশদিনব্যাপী চিত্রপ্রদর্শনীর মাধ্যমে ব্রিটিশ ছবির একটি ঐতিহাসিক পরিচয় দেবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

প্রদর্শনীর উদ্বোধন দিবসে ব্রিটিশ ছবি সম্পর্কে শ্রীসত্যজিৎ রায়ের একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যবান ভাষণ প্রদর্শনীর পক্ষে একটি উপযুক্ত পটভূমিকা রচনা করেছিল। শ্রীরায়ের মতে এতাবৎ ব্রিটিশ ছবির প্রধান দুর্বলতা ছিল তার বাক্‌বাহুল্যে, দৃশ্যগুণের অভাবে, ক্যামেরার সঙ্কোচশীলতায়। হাল আমলের ব্রিটিশ নব্যপন্থীরা নিজের দেশের ছবির দোষ সম্পর্কে অনুরূপ কথাই ভাবেন। "ফিল্মস্ অ্যাণ্ড ফিল্মিং" পত্রিকায় (মে, ১৯৬৩ সাল) প্রকাশিত এক আত্মসমালোচনামূলক প্রবন্ধে শ্লেশিংগার (এ কাইণ্ড্ অফ্ লাভিং-এর পরিচালক) স্বয়ং লিখেছেন…"most of our films rely far too much on dialogue. Even the most literary of the French and Italian films are primarily visual."…We are a nation of conformists, and this is difficult to escape from……We rarely seem to be able to conceive an idea entirely in cinematie terms…" তবে সত্যজিৎ রায়ের অভিযোগ প্রধানত ব্রিটিশ কাহিনী চিত্রপ্রসঙ্গে, প্রামাণ্যচিত্রে ব্রিটিশ ছবির অসামান্য বৈভবকে তিনি শ্রদ্ধা করেন। শ্লেশিংগারেরই একটি বিখ্যাত প্রামাণ্যচিত্র "টার্মিনাস্" দিয়ে প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন সেদিক থেকেও যথোপযুক্ত হয়েছিল। লণ্ডনের রেলস্টেসনে বিচিত্র লোকের সমাবেশকে

অবলম্বন করে এই মানব নক্সাটিতে শ্লেশিংগার আশ্চর্য পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অপূর্ব রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন।

প্রদর্শনীর জন্য চিত্র নির্বাচন করেছেন স্বয়ং ব্রিটিশ ফিল্ম ইন্‌স্টিটিউট্‌। তাঁদের নির্বাচন প্রশংসনীয়, অবশ্য ত্রুটিবিহীন নয়। মুভি ক্যামেরার আদিযুগের সংবাদ চিত্রগুলি কৌতূহল মেটায়। নির্বাকযুগের কাহিনী চিত্ররচনার নিদর্শন হিসাবে ব্রিটিশ চলচ্চিত্র শিল্পের পুরোধা অ্যান্টনি অ্যাস্‌কুইথের "শুটিং স্টার্স" (১৯২৮)-এর নির্বাচন প্রশংসনীয় কিন্তু অ্যাস্‌কুইথের "কটেজ্‌ অন্‌ ডার্টমুর" (১৯৩০)-এর অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন ছিল না। বরঞ্চ হিচ্‌ককের দুটি ছবি নির্বাচন তাৎপর্য পূর্ণ কেননা "লজার" (১৯২৬) নির্বাক যুগের এবং "ব্ল্যাক্‌মেইল" শব্দযুক্ত যুগের প্রতিনিধি। ক্যারল রিডের "স্টার্স লুক্‌ ডাউন" (১৯৩৯) ব্রিটিশ চলচ্চিত্রে সমাজচেতনা জাগরণের প্রকৃষ্ট দলিল ছবিটি চলচ্চিত্রগত নানাগুণে বিভূষিত। তবে রিডের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে "অড ম্যান্‌ আউট"-ই নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। এ অনুষ্ঠান সূচীতে ঐ ছবিও প্রদর্শিত হতে পারত তাহলে ব্রিটিশ চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠ ফলের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সম্ভব হত। "ডিরেক্টর অ্যাণ্ড দি ফিল্ম" নামে এক সাক্ষাৎকার চিত্রে ডেভিড লীনের পরিচালনা পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া গেল বটে—তবে দশদিনব্যাপী অনুষ্ঠান সূচীতে তার "ব্রীফ এন্‌কাউন্টার" বা "অলিভার টুইস্ট" অন্তর্ভূক্ত হতে পারত। সর্বশেষে ইতিহাসকে আধুনিকতম পর্যায়ে এনে ইংলণ্ডের সর্বাধুনিক 'নবতরঙ্গের' প্রতিনিধি হিসাবে শ্লেসিংগার-রিচার্ডসন ক্লেটনের—"এ কাইণ্ড অফ্‌ লাভিং" "লুক্‌ ব্যাক্‌ ইন্‌ অ্যাঙ্গার" "রুম্‌ এট্‌ দি টপ্‌"-এর যে কোনো একটি, কিংবা সাম্প্রতিকতম পর্যায়ের কারেল্‌ বাইজের "স্যাটার ডে লাইট্‌ এ্যাণ্ড সান্‌ডে মর্নিং" কিংবা লিণ্ড্‌সে এণ্ডারসনের "স্পোর্টিং লাইফ্‌" প্রদর্শিত হলে উৎসবটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পেত। উদ্বোধনী ভাষণের শেষে সত্যজিৎ রায় বলেছেন—অতীতে ব্রিটিশ ছবি সম্পর্কে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিলনা বর্তমানে তিনি ব্রিটিশ ছবির জন্য প্রতীক্ষায় থাকেন। এ কথার তাৎপর্যও তাহলে বোঝা যেত।

তবে ঐ অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এই উৎসবে ব্রিটিশ চলচ্চিত্রের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করবার সুযোগ পাওয়া গেছে। লক্ষ্য করা গেছে কি ভাবে অ্যাস্‌কুইথের ছবিতে নির্বাকযুগের বিশিষ্ট সম্পাদনা পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়েছে। হিচ্‌ককের অসামান্য আঙ্গিকনৈপুণ্য দেখা গেছে "ব্ল্যাকমেইলে"—এবং সেখানে

দেখা গেছে কাহিনীগত শস্তা সাস্‌পেন্স-এর উপর নির্ভর না করে মানসিক দ্বন্দ্বের চিত্রণের চেষ্টা। ক্যারল রিডের "স্টার্স লুক ডাউন"-এ কয়লাখনির শ্রমিকের জীবনচিত্রণে ব্রিটিশ চলচ্চিত্রে সমাজচেতনার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শিল্পরূপ পাওয়া গেছে। রয় বোল্টিং-এর "থাণ্ডার রক্‌"ও যুগসমস্যাচিত্রণ ও আলোকসম্পাতে নতুন ডাইমেনশন রচনার জন্য উল্লেখযোগ্য এবং সেই সঙ্গে ব্রিটিশ ছবির অন্যতম ত্রুটি বাকবাহুল্যের যথাযথ নিদর্শনও ঐ ছবিতে লভ্য। ঐ দুটি ছবি আরেকটি কারণে উল্লেখযোগ্য ঐ দুই ছবিতে মাইকেল্‌ রেড্‌গ্রেভের অভিনয় দেখবার সুযোগ পাওয়া গেছে।

প্রদর্শনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল কাভালকান্তি কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত "ফিল্ম এণ্ড রিয়ালিটি।" বাস্তবজগৎ চলচ্চিত্র শিল্পে কি ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে পৃথিবীর সবদেশের প্রামাণ্য ও কাহিনী চিত্র থেকে নির্বাচিত দৃশ্যাংশের মাধ্যমে কাভালকান্তি সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এতে রট্‌মানের "বার্লিন", পাব্‌স্টের "কামবার্ড শাষ্ট্‌", রেনোয়ার "গ্রাণ্ড ইলিউশন্‌", আইজেনস্টাইনের 'পটেমকিন' ও 'জেনারেল লাইন', ফ্লাহাটির ছবি, প্রভৃতির অংশ বিশেষ দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে।

ধ্রুব গুপ্ত

পাঠকদের প্রতি

'পরিচয়'-এর উন্নতির জন্য আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করছি। পাঠকদের সহৃদয় সহযোগিতা না পেলে এ চেষ্টা সফল হতে পারে না। পরিচয় কেমন হচ্ছে, কেমন হওয়া উচিত, কোন সংখ্যা তাঁদের ভালো লাগে, কী ধরনের লেখা তাঁরা চান তাই এবিষয়ে পাঠকদের মতামত আমরা আহ্বান করছি। নিঃসংকোচে তাঁরা তাদের বক্তব্য জানাতে পারেন, —বক্তব্য যদি তিক্তও হয় ক্ষতি নেই—সম্পাদকবর্গ প্রত্যেকটি চিঠিকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে বিচার করবেন এবং সাধ্যমত পাঠকদের চাহিদা মেটাবার চেষ্টা করবেন।

পরিচয়-এ প্রকাশিত প্রত্যেকটি রচনা সম্পর্কে পাঠকদের মতামত পেলে আমরা খুশী হব এবং দরকার মত পাঠকগোষ্ঠী বিভাগে এ-সব চিঠিপত্র প্রকাশ করব।

সম্পাদক, **পরিচয়**

পুস্তক পরিচয়

Problems of Contemporary History: R. Palme Dutt; Lawrence & Wishart, London. 15 sh..

রজনী পাম্ দত্ত ব্রিটেনের শ্রুতকীর্তি মার্কসীয় চিন্তানায়ক। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ল্যাসিক্সের অসাধারণ মেধাবী ছাত্র, ১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের বিরোধিতা করার জন্য লণ্ডনের ওয়াণ্ডস্‌ওয়ার্থ কারাগৃহে কিছুদিন অন্তরীণ থাকার পর অক্সফোর্ডের বেলিওল কলেজে স্কলারশিপ পেয়ে অক্সফোর্ডে পড়তে আসেন ১৯১৬-তে। তখন তাঁর বয়স কুড়ি বছর। রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবের পক্ষকাল পূর্বে আসন্ন বিপ্লবের সমর্থনে সভা করার জন্য অক্সফোর্ড থেকে তিনি হন বিতাড়িত। পরের বছর তাঁকে পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেওয়া হয় তিনটি শর্তে; অক্সফোর্ডে পরীক্ষার দিনের পূর্বে এসে পৌছনো চলবে না, পরীক্ষান্তে অবিলম্বে অক্সফোর্ড ত্যাগ করতে হবে এবং পরীক্ষা চলাকালীন অক্সফোর্ডে থাকতে যেহেতু হবেই সে সময়ের মধ্যেও কোনো সভায় যোগদান বা বক্তৃতা করা চলবে না। এই মেধাবী ছাত্রটির সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সাবধানতা অবলম্বনের ত্রুটি করেন নি। এখানে বলে রাখা যেতে পারে পরীক্ষায় সবকটি পেপারেই আলাদা করে তিনি ফার্স্ট ক্লাস পান, যা খুবই বিরল, এ পর্যন্ত মাত্র দু-একজন পেয়েছেন।

পাম্ দত্ত বহু বই লিখেছেন, কিন্তু এই প্রথম আলোচ্য পুস্তকটিতে উপরোক্ত ঘটনার সামান্য ব্যক্তিগত উল্লেখ পাওয়া গেল, তাও মূল আলোচিত সমস্যার (সাম্প্রতিক ইতিহাস প্রণয়নের) পটভূমিতে। তাঁর বিচিত্র সংগ্রামী জীবনের আরো বহু ঘটনা সমালোচকের জানবার সুযোগ হয়েছিল, যা এখানে স্থানাভাবে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলাই বোধ হয় যথেষ্ট যে, ব্রিটেনের বুর্জোয়া চিন্তাধারার বিশিষ্ট নেতারাও যাঁকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ বলে মনে করেন, সেই পাম্ দত্তের জীবনে কিন্তু বিশুদ্ধ চিন্তার বিলাস কখনও স্থান পায় নি। চিন্তার সঙ্গে কর্মের, থিওরির সঙ্গে প্র্যাকটিসের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে তাঁর জীবনে। তাই তাঁকে দেখি ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য হিসাবে ১৯২০ সালে হ্যারি পলিট,

উইলিয়াম গ্যালাকার, এলবার্ট ইনক্‌পিথের সঙ্গে; অন্যদিকে বালক বয়সেই ডাক্তার পিতা উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্তের (উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত লেখক, ইতিহাস ও অর্থনীতিবিদ রমেশচন্দ্র দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র) কাছে তাঁর প্রথম রাজনৈতিক চেতনার জন্ম, ভারতবর্ষকে ও নিপীড়িত জনসাধারণকে ভালোবাসতে ও তাদের মুক্তিসংগ্রামের অংশীদার হতেও হাতেখড়ি হয় ঐ পিতার কাছেই।

১৯২৪ সালে রজনী পাম্ দত্তের বই "মডার্ন ইণ্ডিয়া" প্রকাশিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তদানীন্তন ভারতের ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বইটিকে বে-আইনী ঘোষণা করেন। পরে ১৯৩৯-এ এই পুস্তকেরই আরো বর্ধিত ও প্রামাণিক সংস্করণ "ইণ্ডিয়া টু-ডে" (প্রথমে বে-আইনী ঘোষিত হলেও ১৯৪৬-এর পরে ভারতের ও ১৯৪৯-এর পরে পৃথিবীর বহু ভাষায় তর্জমা করা হয়েছে) উৎসর্গীত হয়েছে তাঁর পিতার নামে, যা থেকেও বোঝা যায় যে, ভারতের প্রতি রজনী পাম্ দত্তের গভীর ভালোবাসা ও স্বাজাত্যবোধের মূল উৎস একদিকে মার্কসীয় জীবনাদর্শ, অন্যদিকে তাঁর পিতার শিক্ষা ও প্রেরণা।

রজনী পাম্ দত্তের অন্যান্য পুস্তকাদি যেমন 'Fascism and Social Revolution' (1934) ও 'World Politics' (1936) ত্রিশ-চল্লিশ দশকের বহু ছাত্রকে (সমালোচক তাদেরই দলে) মার্কসীয় ভাবধারায় আকৃষ্ট হতে বিশেষ সাহায্য করে। আর ১৯৫৩ ও ১৯৫৭-তে দুই সংস্করণে 'Crisis of Britain and British Empire'-এ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার হওয়ার ফলে ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনের নতুন চেহারা ও বিশেষ করে উপনিবেশিক মুক্তি-আন্দোলনের সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক ও লক্ষ্যের অভিন্নতার যে প্রাঞ্জল চিত্র ও কর্তব্যের নির্দেশ পাওয়া যায়, তারই সুচিন্তিত ও পরিষ্কার লক্ষ্য পুনরায় বিশ্লেষিত হয়েছে আলোচ্য পুস্তকটির অন্তে। সমস্ত বিষয়টি সাম্প্রতিক ইতিহাসের ঘটনাবলীর একটি বিশেষ অঙ্গ বলে আলোচ্য পুস্তকের শুরুতেই সাম্প্রতিক ইতিহাসের মার্কসীয় ও অন্যান্য মতবাদের বিচারের কিছু তুলনামূলক আলোচনাও পাওয়া যাবে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিশেষ করে স্নায়ুযুদ্ধের (cold war) আরম্ভ থেকে যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও বিশ্লেষণ রজনী পাম্ দত্ত করেছেন, আমরা আপাতত সে আলোচনায় যাব না।

বুর্জোয়া সমাজের প্রতি ইতিহাসের এটি বোধহয় একটি ছোট্ট পরিহাস

যে রাশিয়ান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমর্থন করার জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রজনী পাম্ দত্ত বিতাড়িত হন শেষ অবধি সেই বিজয়ী সমাজতন্ত্রের পীঠস্থানেই মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ইতিহাসে অনারারি ডক্টরেট উপাধি প্রদান করল। আলোচ্য পুস্তকটি সেই ডক্টরেট উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর মূল অংশবিশেষ।

আমাদের কালের সাম্প্রতিক ইতিহাসের পর্বকাল কবে থেকে শুরু? মার্কসীয় বিচারে নিশ্চয়ই ১৯১৭-র রুশ বিপ্লবে, যখন থেকে ধনতন্ত্রের অবসান আরম্ভ। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে যে, সাম্প্রতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিলগুলি পাওয়া শক্ত, অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, বিশেষ করে ঘটনাবলী সাম্প্রতিক কালের হওয়াতে ইতিহাসের মার্কসীয় বিচারে অনেক সময়ই যান্ত্রিক ব্যাখ্যার নিদর্শন পাওয়া যায়। অর্থাৎ শ্রেণীসংগ্রামের জটিলতাকে উপেক্ষা করে উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে উৎপাদন শক্তির বিরোধের একটা সাধারণ রেখাচিত্র মাত্র উপস্থিত করা হয়। অনেক সময়ে তাও হয়তো আংশিকভাবে ভুল; এরকমের ভ্রান্তি সব দেশেই আছে।

কন্‌রাড স্মিডকে ১৮৯০-তে লিখিত এঙ্গেলসের চিঠি লেখক উল্লেখ করেছেন। এঙ্গেলস সাবধান করে দিচ্ছেন সেই সমস্ত মার্কসীয় 'ঐতিহাসিক'-দের বিরুদ্ধে, যারা "make use of the phrase historical materialism in order to get their own relatively scanty historical knowledge fitted together into a neat system as quickly as possible."

মার্কসের মৃত্যুর পরে এঙ্গেলস ইতিহাসের এই যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে যেন বিশেষ করেই অবহিত ছিলেন। ঐ ১৮৯০-এরই ২১-২২শে সেপ্টেম্বর জে ব্লককে লেখা এঙ্গেলসের আর একটি চিঠিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এঙ্গেলস বলছেন:

"According to the materialist conception of history, the *ultimately* determining element in history is the production and reproduction of real life. More than this neither Marx nor I have ever asserted. Hence if somebody twists this into saying that the economic element is the *only* determining one, he transforms that proposition into a meaningless,

abstract, senseless phrase. The economic situation is the basis, but the various elements of the superstructure—political forms of the class struggle and its results, to wit! Constitutions established by the victorious class after a successful battle, etc. juridical forms, and even the reflexes of all these actual struggles in the brains of the participants, political, juristic, philosophical theories, religious views and their further development into systems of dogmas—also exercise their influence upon the course of the historical struggles and in many cases preponderate in determining their *form*." (বাঁকা হরফ মূল লেখাতে)

এই বিখ্যাত চিঠিরই অন্তে এঙ্গেলস আত্মসমালোচনা করে বলেছেন যে, হয়তো এরকম যান্ত্রিক বিভ্রান্তির জন্যই তিনি ও মার্কস অংশত দায়ী, কিন্তু একটি নতুন চিন্তাধারাকে বিশেষ জোরের সঙ্গে চালু করতে গিয়েই হয়তো সেটা ঘটেছে। তবে মার্কসের লিখিত 'The Class Struggles in France', 'The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte' বা 'The Civil War in France' এঙ্গেলসের মতে ইতিহাসের বস্তুবাদী বিচার-পদ্ধতির বিশিষ্ট ও প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মার্কসের সময়ের সাম্প্রতিক ইতিহাসের ঘটনাবলী নিয়েই লেখা এগুলি, রজনী পাম্ দত্তও সেগুলির উল্লেখ করে বিশেষ জোর দিয়েই দেখাচ্ছেন যে, সাম্প্রতিক ইতিহাসের বিচারে যত অসুবিধাই থাক, একমাত্র মার্কসীয় পদ্ধতিরই (methodology) আশ্রয় নিলে সঠিক পথের নির্দেশ মিলবে।

সাম্প্রতিক ইতিহাসের বিচারে গুপ্ত দলিল ইত্যাদি পাওয়ার অসুবিধা ছাড়াও অনেক সময়ই সাম্প্রতিক রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের নিরসন না হওয়াতে ঐতিহাসিকের পক্ষে বিষয়মুখী (objective) বিশ্লেষণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কেবলমাত্র সাম্প্রতিক ইতিহাসের রাজনৈতিক নেতারা নন, ঐতিহাসিকের মনেও সাম্প্রতিক দ্বন্দ্বের প্রতিফলন এমনভাবে ঘটে যে, ভবিষ্যৎ কাল বিচার করে হয়তো অন্য সিদ্ধান্তে এলেও সাম্প্রতিক কালের পটভূমিতে বিরোধের বিষয়গুলি ঐতিহাসিকের বিচারকে প্রভাবান্বিত করে। উদাহরণস্বরূপ, ফরাসী বিপ্লবের নেতাদের সম্পর্কে অর্ধশতাধিক বৎসরের

ব্যবধানে আজকের ঐতিহাসিকের বিচার ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে তথনকার সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকের বিচারের তুলনা করে দেখা যেতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক দেশেও এর ব্যতিক্রম হয় নি, রজনী পাম্ দত্ত বলছেন: "...Marxist historical work, also after the establishment of a socialist regime, may not be affected by current political trends and controversies in such a way as to prove unfavourable rather than helpful to a just and balanced historical treatment."

তিনি বলেছেন: "We have seen, as shown from the conclusions reached by the Twentieth and Twenty-Second Congresses of the C. P. S. U., how during the period of intense international tension and ordeals of the emerging socialist society, under the conditions from which arise the deformation defined as 'the cult of personality', this deformation had also its serious adverse effects on Marxist-Leninist historical work, partially distorting the treatment of contemporary history, and in the wider historical field cramping initiative and independent judgment. But the Twentieth and Twenty-Second Congresses have shown the capacity of a socialist society to recognise and correct these shortcomings, and we can be confident that the great work of Marxist-Leninist historical research and study will be carried forward with all the fuller vigour, richness and unsparing devotion to the cause of true historical understanding."

পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশে সমাজতন্ত্রের মূল শ্রেণীবিহীন চরিত্রের সামাজিক কাঠামো গড়ে উঠার ফলে (তার মধ্যে যতো রকমের বিচ্যুতি বা রকমফের যতই থাক না কেন) ধনতান্ত্রিক সমাজের বহু চিন্তানায়ক দু-রকমের ধারণা প্রচার করবার চেষ্টা করেন, যার আসল মিল হচ্ছে একজায়গায়। উনবিংশ বা প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগের মতো খোলাখুলি ধনতান্ত্রিক সমাজের গুণগান আর করা চলে না; কাজেই তাঁরা উঠে পড়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন

যে, একদিকে ধনতান্ত্রিক সমাজেরও যেমন রূপ পরিবর্তন হয়ে তা 'জনগণের ধনতন্ত্র' (people's capitalism) ধরনের সমাজব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে মার্কসইজ্‌ম-লেনিনইজ্‌মের ধনতান্ত্রিক সমাজ সম্পর্কে মূল ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত নাকি আজকে একেবারেই অচল।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দ্বারা সেই সমাজে উত্তরণের পথ সম্পর্কে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের মূল বক্তব্য রজনী পাম্ দত্ত সুসংবদ্ধভাবে উপস্থিত করেছেন আলোচ্য পুস্তকটিতে। কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহারে সময় ১৮৪৮ নাগাদ জার্মান বুর্জোয়া বিপ্লবের সম্ভাবনা ছিল দ্রুত অগ্রসর হয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে পৌছবার। কার্যত, তা হয় নি। ১৮৯৫ সালের ৬ই মার্চ মার্কসের 'ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম' পুস্তকের নতুন ভূমিকা লিখতে গিয়ে এঙ্গেলস আত্মসমালোচকের দৃষ্টিতে বিশেষ করে বৃহৎ পুঁজিপতি গড়ে ওঠার যে নজির রেখেছেন, পরবর্তী যুগের লেনিনের ধনতান্ত্রিক সমাজের একচেটিয়া পুঁজিবাদে (বা সাম্রাজ্যবাদে) রূপান্তরের ঝোঁক বুঝতে সেটি বিশেষ সাহায্য করে।

মার্কসের ১৮৫০-এর পরের লেখাগুলি, বিশেষ করে চীন ও ভারত সম্পর্কে তাঁর উক্তি এবং ১৮৬৯ সালে প্রথম আন্তর্জাতিকের বিখ্যাত প্রস্তাব: "A people which enslaves another people forges its own chains." (মার্কসের দ্বারা খসড়া লিখিত)—এই সমস্ত থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সাম্রাজ্যবাদী দেশের উপনিবেশিক মুক্তিস্বাধীনতা আন্দোলনের দাবিতে মার্কস ও এঙ্গেলসের অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল ধোঁয়াটে মানবতার খাতিরে নয় ও তাঁরা তথনই এটা পরিষ্কার বুঝেছিলেন যে, পররাজ্যলোলুপ সাম্রাজ্যবাদী দেশের (যদিও লেনিনের সাম্রাজ্যবাদের বিজ্ঞানসম্মত অর্থনৈতিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা তখন নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল না) শ্রমিক আন্দোলনের ও উপনিবেশিক মুক্তিসংগ্রামের মধ্যে ওতপ্রোত সম্পর্ক তো রয়েছেই, কারণ তারা একই শ্রেণীশত্রুকে আঘাত করছে; পরন্তু উপনিবেশিক মুক্তিসংগ্রাম জয়ী না হলে পুরো ধনতান্ত্রিক অগ্রসর দেশগুলিতে (যেমন ইংলণ্ড) শ্রমিকশ্রেণী জয়ী হতে পারবে না। ২৯শে নভেম্বর, ১৮৬৯-তে বন্ধু কুগেলম্যানকে মার্কস লিখছেন যে, আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আমরা দাবি করি: "not as a matter of sympathy with Ireland, but as a demand made in the interests of the English proletariat. If not, the English people will remain tied to the leading strings

of the ruling classes, because it must join with them in a common front against Ireland."

এঙ্গেলসের অবশ্য তখনও ধারণা ছিল যে, হয়তো ধনতান্ত্রিক অগ্রসর দেশের শ্রমিকশ্রেণীই প্রথম ক্ষমতা দখল করে উপনিবেশগুলিকে (ভারতের বিপ্লব অবশ্য আগেই হবে বলে তিনি বলেছেন) মুক্তি দেবে (১২ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২-তে কাউট্‌স্কিকে লিখিত পত্র)। মার্কসের মত ছিল একটু অন্যরকমের "The English working class will *never accomplish anything* before it has got rid of Ireland." (বাঁকা হরফ মূল লেখাতে)।

মার্কসের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে ১৮৮২-তে কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহারের রাশিয়ান সংস্করণের ভূমিকায় ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রগতি সম্পর্কে মার্কস এঙ্গেলসের বক্তব্য ভবিষ্যদ্বাণীর পর্যায়ে পড়ে। তাঁরা লিখছেন :

"During the revolutions of 1848-49 not only the European princes, but the European bourgeois as well, found their only salvation from the proletariat, just beginning to awaken in Russian intervention. The Tsar was proclaimed the chief of European reaction. Today he is a prisoner of war of the revolution, in Gatchina, and *Russia froms the vanguard of revolutionary* action in Europe." (বাঁকা হরফ আমার)।

মার্কস এঙ্গেলসের পরে লেনিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধন করলেন রাশিয়াতে আর তৃতীয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক স্থাপনের দ্বারা পৃথিবীর সর্বত্র কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে তাদের এক ভ্রাতৃত্বমূলক বন্ধনে বেঁধে দিলেন। লেনিনের মতে দুনিয়া জুড়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হবেই, কারণ রাশিয়া, ভারত ও চীন—পৃথিবীর বৃহত্তম জনসাধারণ 'বৈপ্লবিক' আন্দোলনে জয়ী হবার পথে নিশ্চিত অগ্রসর হয়েছেন। ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে, মৃত্যুর প্রায় দশমাস পূর্বে লেনিন লিখছেন :

"In the last analysis, the upshot of the struggle will be determined by the fact that Russia, India, China, etc. account for the overwhelming majority of the population of the globe. And it is precisely this majority that during the past few years has been drawn into the struggle for emancipation with

extraordinary rapidity, so that in this respect there cannot be the slightest shadow of doubt what the final outcome of the world struggle will be. In this sense, the complete victory of socialism is fully and absolutely assured."

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর যুগে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চীন, পূর্ব ইউরোপ এবং এখন কিউবাকে নিয়ে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশে সমাজ-তান্ত্রিক জগৎ, অন্যদিকে ভারত ও এশিয়া ভূখণ্ডের বহু দেশ ও অন্ধকার আফ্রিকাতেও বেশ কিছু স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন লেনিনের অন্তিম বাণীর সার্থক রূপায়ণ। সদ্য-স্বাধীন এশিয়া ও আফ্রিকাতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন না হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু "নিশ্চয়ই মানবসমাজের 'সর্ববৃহৎ গরিষ্ঠ' অংশ মানবমুক্তির জন্য অত্যন্ত তাড়াতাড়ি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে" বহু দেশে অন্তত রাজনৈতিক স্বাধীনতা স্থাপন করেছে এবং অনিবার্যভাবেই সেই সমস্ত দেশে সামাজিক মুক্তিরও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক চীনের স্বাধীন ভারতের ওপর আক্রমণে মানবমুক্তির সেই বিরাট ও বিস্তৃত সেনাবাহিনী বিভক্ত হতে পারে। কথায় লেনিনের নামে শপথ গ্রহণ না করে সমাজতান্ত্রিক চীন এদিকটা ভেবে দেখতে পারেন। ভারতের প্রগতিশীল ও সমাজতান্ত্রিক শক্তি-সমূহের তরফ থেকে এই কথা ঘোষণা করা যেতে পারে যে, ভারতের জোট-নিরপেক্ষতা, তথা বিশ্বশান্তি ও জাতীয় স্বাধীনতার অঙ্গীকারকে চীনের এই বিভ্রান্তি অথবা ভারতের আভ্যন্তরীণ দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার আঘাতেও চ্যুত হতে দেওয়া হবে না ; এই পথেই ভারতে সমাজতন্ত্র একদিন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেদিন পৃথিবীর বাকী অংশ, বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপও পেছিয়ে থাকবে না।

দিলীপ বসু

সোনামুখী মেঘ ॥ দীপনলাল চৌধুরী। ঠাকুর ব্রাদার্স। তিন টাকা ॥

ভৃঙ্গরোল ॥ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। শুক্লা। দু টাকা ॥

অভিসার ॥ অসিত চৌধুরী। অ্যালফাবিটা পাবলিকেশন। তিন টাকা, পচাত্তর ন. প. ॥

সোনামুখী মেঘ উপন্যাসটি কিছুটা নতুন রীতির ভঙ্গিতে রচনা। ভাষা কিছু আড়ষ্ট মনে হল, তবু বেশ পড়ে ফেলা যায়।

ভৃঙ্গরোল ও অভিসার হালকা চালে লেখা কয়েকটি ছোট গল্পের সংকলন।

দিলীপ চক্রবর্তী

"অভিযান প্রসঙ্গে"

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায়ের চলচ্চিত্রে প্রতিভার অপমৃত্যু সংক্রান্ত চিঠিতে মন্তব্যগুলি বিচারের অপেক্ষা রাখে।

প্রথম কথা, সত্যজিৎ রায়ের "অভিযান" তার শিল্পপ্রতিভার যথার্থ পরিচয় বহন না করলেও তাতে কোনো 'অধোগতি'র চিহ্ন নেই, কাজেই "কাঞ্চনজঙ্ঘা" স্রষ্টার প্রতি আমার অবিমিশ্র শ্রদ্ধাকে প্রিয়জনের দোষ গোপন করবার প্রচেষ্টা বলে উদ্ভট রকমের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় আমি কিছুটা বিস্মিত। 'অভিযান'-এ বাণিজ্যিক আপস-এর চল্‌তি অভিযোগে অশোকবাবু গলা মিলিয়েছেন—'অভিযানে'র বাণিজ্যিক সার্থকতার খাতিরেই যদি এই ধারণা করা হয়—তবে "পথের পাচালী"ও এ বদনাম থেকে রেহাই পাবেনা। ওয়াহিদা রেহমানকে নেওয়া হয়েছে জনরঞ্জনের খাতিরে নয়, তাকে deglamourise করা হয়েছে শিল্পের খাতিরে, ঋত্বিক ঘটকও একাজ করেছিলেন সুপ্রিয়া চৌধুরীকে "মেঘে ঢাকা তারায়।" কোন বিশেষ কারণে 'অভিযানে' তিনি business motive খুঁজে পেয়েছেন তা এখনও আমার বুদ্ধির অগোচর।

"কাঞ্চনজঙ্ঘা" অশোকবাবুর কাছে উল্লেখযোগ্য ছবি বলে মনে হয়নি—আমার কাছে মনে হয়েছে—এর সঙ্গে 'অভিযানে'র "অধোগতি"র কোনো সম্পর্ক নেই। "কাঞ্চনজঙ্ঘা"তে বক্তব্যের গভীরতা নেই এর সহজ জবাব—আধুনিক সমাজে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের যে জটিলতা তাকেই এ ছবিতে উদ্ঘাটিত করা হয়েছে। পরিবারে পিতৃপ্রতাপ, অর্থনৈতিক কাঠামোতে উচ্চবিত্তের প্রতাপ, বিবাহের অনিশ্চয়তা প্রেম ও নিরাপত্তার প্রশ্ন, এবংবিধ আমাদের নিতান্ত আধুনিক কালের গভীরতম জটিলতম সমস্যার পটভূমিকায় কয়েকটি ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ককে রূপায়িত করা হয়েছে অনুচ্চার সঙ্গীতের মতো এক চিত্রনাট্যে। নেহাৎ জেদের বশে ছাড়া অন্য কোনো কারণে এর গভীরতা অস্বীকার করা যায় না। উত্থাপিত সমস্যাগুলির সমাধান এ ছবিতে নেই বলে যাঁরা আপত্তি করেন, তাঁরা দূর থেকেই নমস্য।

এ ছবিতে অবিস্মরণীয় মুহূর্তের একটা তালিকা দেওয়া যেতে পারে—মনীষার কাছ থেকে ব্যানার্জীর উত্তর প্রার্থনার দৃশ্যে চলমান প্রস্তর গলার

ঘণ্টার শব্দ, অশোকের চাকরী প্রত্যাখ্যানের দৃশ্য, আণবিক পরীক্ষার ফলে পক্ষীকুলের প্রাণনাশের আশংকায় প্রৌঢ়ের উদ্বেগ প্রকাশ, নির্জনতায় লাবণ্যের রবীন্দ্রসঙ্গীত, কুয়াশার মধ্যে গাছের গুঁড়ি ঘিরে মনীষার চাপা কান্নার দৃশ্য, রায়বাহাদুরের ইংরেজ প্রশস্তির সঙ্গে সঙ্গে 'কাট' করে ব্যাণ্ড পার্টির শট্, অনিমার সঙ্গে স্বামীর বোঝাপড়ার দৃশ্য (অশোকবাবু কেবল অরুণ মুখার্জীর অভিনয়ের উল্লেখ করেছেন—অনুভা গুপ্তা, সুব্রত সেন, করুণা ব্যানার্জী, বিশ্বনাথন, অলকনন্দা রায় সম্পূর্ণ চলচিত্রোপযোগী অভিনয়ে যে সূক্ষ্ম শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁর বিবেচনায় উল্লেখযোগ্য মনে হয়নি অথচ এ জাতীয় অভিনয় দেশ বিদেশের ছবি মিলিয়ে আমি খুব কমই দেখেছি)। এ ছাড়া ধীর লয়ের লং শট্‌গুলির সৌন্দর্যও ভোলবার নয়। সংলাপ রচনায় সত্যজিৎ রায় যে চলচ্চিত্রোপযোগিতা ও সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনাও বিরল :—

মনীষা :—আমার মনে হয়……

ব্যানার্জী (ব্যগ্রভাবে) :—কী, কী মনে হয়……

মনীষা :—আজ mist হবে !

ব্যানার্জী :—(হতাশ হয়ে) ও।

মনীষা :—আপনার কুয়াশা ভাল লাগেনা বুঝি ?

ব্যানার্জী :—হ্যাঁ, it is very healthy.

পরিমিতি বোধে রচিত এই সংলাপ শুধু মাত্র রচয়িতার বুদ্ধিমত্তার জন্যই উল্লেখযোগ্য নয়—এতে চরিত্রের ব্যঞ্জনাও লভ্য।…আধুনিক কবিতা বা ছোটগল্পের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সাধর্ম্যের ইঙ্গিতটা আমার কাছে স্পষ্ট হয় নি। তবে এটুকু বলতে পারি প্রতীকের ব্যবহার সবছবিতে সমপরিমাণে হয় না। এ ছবির চিত্রনাট্য প্রতীকাশ্রয়ী নয়, যেমন নয় রেণের "হিরোশিমা মন আমুর"-এর চিত্রনাট্য। এটা চিত্রনাট্যের চরিত্র—দোষ বা গুণ নয়। Detail হিসাবে পাহাড়ী বালক, অন্ধভিখারী উল্লেখযোগ্য। তবে অদৃশ্যভাবেও সমস্ত ছবি জুড়ে মহাপ্রতীকের মতো বিরাজ করছে কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার শৃঙ্গ যার নৈর্ব্যক্তিক বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের কোলে চলছে মনুষ্যের ব্যক্তিগত নাট্যলীলা। আর ব্যঞ্জনার সহায়ক হিসাবে সত্যজিৎ রায় এ ছবিতে রং-এর ব্যবহার করেছেন। "ফ্যাকাশে" রং বলতে কি বোঝানো হয়েছে জানিনা, তবে এ ছবির মেজাজের খাতিরেই এখানে কোনো উজ্জল বর্ণ ব্যবহৃত হয় নি—

বরঞ্চ রং-এর চরিত্রে বিষণ্ণতা পরিস্ফুট। ছবিতে রং-এর ব্যবহার এখনও পরীক্ষামূলক স্তরে আছে। Visconti-র (ভিস্‌কাউন্টি কেন? ভিসকান্তি বা নিদেনপক্ষে ভিস্‌কন্টি) "Senso" David Lean-এর "Summer time", Yutkevich-এর "Othello" প্রমুখ কয়েকটি ছবিছাড়া রং-এর ব্যবহার এখনও চরম সার্থকতায় পৌছয়নি। "কাঞ্চনজঙ্ঘা" সেই সার্থকতার তালিকায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। স্বয়ং আইজেনস্টাইন্ তাঁর Ivan the Terrible-II তে একটি দৃশ্যে রং নিয়ে পরীক্ষা করেছেন—এবং লেখাতেও রং-এর প্রয়োগের অসামান্য শৈল্পিক সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এসব জানলে তিনি রং-এর ব্যবহারের বিরুদ্ধে মামুলী বচনের পুনরাবৃত্তি করতেন না।

পাশ্চাত্য চলচ্চিত্রজগতে প্রতিভার অপমৃত্যু ঘোষণাকালে তিনি অবনতির নিদর্শন হিসাবে "La Dolce Vita," "Virgin Spring", La Notte, "Rocco & his brothers"-এর নাম করেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে "পরিচয়ের বিদগ্ধ পাঠকের" অনেকেরই সুযোগ ঘটেনি ঐ বহু আলোচিত ছবিগুলি দেখবার। কাজেই তাদের উপর ঐ বিখ্যাত ছবিগুলি সম্পর্কে অশোকবাবুর সংক্ষিপ্ত মারাত্মক মন্তব্যগুলি লোষ্ট্রাঘাতের সামিল হয়েছে। কেননা, আমরা যারা পাশ্চাত্য চলচ্চিত্র সমালোচনার একটু আধটু খোঁজ রাখি, তারা জেনেছি যে ঐ ছবিগুলি—বিশেষ করে "লা নত্তে" এবং "লা দল্‌চে ভিতা" আধুনিক চলচ্চিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে অভিনন্দিত হয়েছে। এমন কি যারা ঐসব ছবির গুণগ্রাহী নন তারাও ছবিগুলিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিস্তৃত আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন। সে ক্ষেত্রে, অশোকবাবু "জনরঞ্জক", "অসাধারণত্ববর্জিত" ইত্যাদি বিশেষণ নিক্ষেপে কি ঐসব ছবির স্রষ্টা এবং দর্শকদের প্রতি অবিচার করেন নি?

সৌভাগ্যবশত ঐ সব ছবির মধ্যে অন্তত একটি দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে—সেটি ফেলিনির "লা দল্‌চে ভিতা"। অশোকবাবু জানেন কিনা জানিনা—ঐ "জনরঞ্জক" ছবি এদেশে জনরঞ্জনে সমর্থ হয়নি, বরঞ্চ অনভিজ্ঞ দর্শককে বিরক্ত করেছে। সে যাক, কিন্তু পশ্চিমী জগতের অবক্ষয়কে তীব্র তিরস্কারের পটভূমিকায় একজন সাংবাদিক সাহিত্যিকের জীবনসন্ধানের ব্যর্থপ্রচেষ্টার ট্র্যাজেডিকে ঐ ছবিতে যেমন নির্মম সত্যতা এবং চিত্ত-আলোড়নকারী ক্ষোভের সঙ্গে চিত্রিত করা হয়েছে তাতে ঐ ছবি এ যুগের একটি শ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি বলে পরিগণিত হতে পারে। এক কথায় এ রকম একটি

তাৎপর্য পূর্ণ ছবিকে নস্যাৎ করে দেবার পেছনে কি মনোবৃত্তি কাজ করে তা আমার বোধের অগম্য।

পাশ্চাত্য জগতে ফ্রান্সে রেণে ক্লেমাঁ গদার্দ উল্লেখযোগ্য চিত্রসৃষ্টি করছেন, ইতালীতে আন্তনিয়নি ভিস্‌কন্তি ছাড়াও পাসলিনি প্রমুখ নতুন শিল্পীরা ছবি তৈরী করছেন, ইংলণ্ডে কারেল রাইজ শ্লেসিংগার—রিচার্ডসন গ্রেনভিল নব্যতরঙ্গের পুষ্টিসাধন করছেন, হল্যাণ্ডে র‍্যাড্‌মেকারের মতো প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর (Knife ছবির পরিচালক) উদ্ভব হচ্ছে, পোল্যাণ্ডে ওয়াইদা, কাওয়ালারোইৎস্ ছাড়াও পোলানস্কির মতো তরুণ শিল্পীরা উল্লেখযোগ্য ছবি তৈরী করেছেন (The Knife in the Water)—এদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে পাশ্চাত্য চিত্রজগৎ সম্পর্কে খামোখা শোকাকুল হবার কারণটি আমার বোধের অগোচর।

শ্রীমুখোপাধ্যায় "কাঞ্চনজঙ্ঘা"তে "দ্বিতীয় শ্রেণীর ইতালী ও ফরাসী ছবির" অনুকরণ আবিষ্কার করেছেন। সে ছবির নামগুলি লেখেন নি কেন? এখানেও তিনি এক চলতি অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করেছেন ঝালটা আরেক কাঠি বাড়িয়ে দিয়ে। সাধারণত "লা নত্তে"র সঙ্গে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র "সাদৃশ্য" উল্লেখ করে সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে আন্তনিয়নিকে অনুসরণ করবার অভিযোগ আনা হয়। "লা নত্তে" সম্পর্কে যা পড়েছি তাতে এ অভিযোগকে ভিত্তিহীন মনে হয়—আর আবার জিজ্ঞাসা করছি "লা নত্তে" কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ছবি?

ধ্রুব গুপ্ত

শিল্পীর স্বধর্ম

বৈশাখ সংখ্যা পরিচয়ে 'শিল্পীর স্বধর্ম' প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লেখকের নিবেদন যে এটি কোনো ফতোয়া নয়। কোনো বিষয় দুভাবে আলোচ্য, সমগ্রভাবে এবং ভেঙে ভেঙে। যোগী, কর্মী ও শিল্পীর পরস্পর সম্পর্ক বুঝবার জন্যে লেখক দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করেছেন। কেউ যদি বলেন ভগবান মহাশিল্পী, রামকৃষ্ণ মহাশিল্পী, এ্যালবার্ট আইনস্টাইন মহাশিল্পী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশিল্পী কিংবা লেনিন মহাশিল্পী তাতে প্রবন্ধ লেখকের যেমন আপত্তি নেই তেমনি অনেকের মতো সন্তোষও নেই। এ প্রবন্ধে তাই বিশেষ ধরনের মানুষের বিশিষ্টকাজ নির্দিষ্টকরণের চেষ্টা। এ চেষ্টায় নিশ্চয় অসুবিধে আছে, পরস্পরের মধ্যে অভেদের পরিবর্তে যে ভেদ তার ওপর জোর দেবার বিশেষ ঝোঁক আছে,

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের কাজের মধ্যে এক বায়বীয় অখণ্ডতা উপলব্ধিতে তৃপ্ত না হয়ে প্রত্যেকের কাজ এবং চিন্তার কিছু পরিমাণ স্পষ্ট এক ছবি পাওয়া যেতে পারে এ পথে।

সঙ্গে সঙ্গে নিবেদন যে এ প্রবন্ধ পক্ষপাতশূন্য মোটেই নয়। প্রবন্ধকার শিল্পীর পক্ষ টেনেই বলেছেন এ সমালোচনাতেও লেখকের আপত্তি নেই। অপক্ষপাতের মায়ায় তিনি বিশ্বাসী নন। লেখক মনে করেন শিল্পকর্মের ওপর অযথা চাপ সৃষ্ট হয় যা শিল্পকর্মের পক্ষে হানিকর। রাজনীতি ও ধর্মের এই চাপ বহুদেশের বহু লেখকদের মতো তাঁর কাছেও পীড়াদায়ক হলেও রাজনীতি ও ধর্মসম্পর্কে 'এলার্জি'-তে ভুগতে তিনি অরাজী। ভগবদবিশ্বাসী ব্লেক এবং রামপ্রসাদ বড় কবি ছিলেন কিংবা মায়াকভ্‌স্কির 'সজ্জিত মেঘ' ভাল কবিতা এ কথা বলাতেও এই রাজনৈতিক ও ধর্মীয় চাপ অস্বীকার করা যায় না।

পাঠকের সামনে এ দুটি নিবেদন রাখলে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা পরিচয়ে শ্রীশান্তি বসুর 'শিল্পীর স্বধর্ম' প্রসঙ্গে উত্তেজিত আলোচনার জবাব প্রায় নিরর্থক। বসু মহাশয়ের সফেন ও প্রচুর উধৃতিপূর্ণ আর্তনাদ সত্ত্বেও আলোচ্য প্রবন্ধের বক্তব্য টাল খায় নি। তিনি সে সম্পর্কে নীরব থেকে রামকৃষ্ণ স্বপক্ষে উচ্চকণ্ঠ হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সঙ্গত ভাবেই বলতে পারতেন যে প্রবন্ধকার যে সব অংশ উধৃত করেছেন তার পাল্টা বক্তব্যও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে আছে। কিন্তু সেই সৎ আলোচনার পথ ছেড়ে তিনি উদ্‌ভ্রান্ত জ্ঞানের আবর্তে ঘুরপাক খেয়েছেন।

অবশ্য উদ্‌ভ্রান্ত এবং উত্তেজিত হওয়া আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। চারপাশের বাতাসে এমন উত্তেজনা যে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য সম্পর্কে আমাদের মধ্যে যাঁরা সরব তাঁরাও উত্তেজিত, উদ্‌ভ্রান্ত। আমাদের কোনো বক্তব্য পরিষ্কার করে তুলতে গিয়ে আমরা জ্বালা, ক্ষোভ ও আত্মাভিমানের দৈন্যে পীড়িত হয়ে পড়ি এবং আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট ক্ষুব্ধ বক্তব্য চূড়ান্ত 'পলেমিক' ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করি। শান্তি বসু মহাশয়ও তাঁর বক্তব্য বলতে গিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কিছু তির্যক গালিগালাজ দেবার চেষ্টা করেছেন তা বিচার্য নয়। তবে তাঁর সাংখ্য, উপনিষদ, গীতা, মহাভারত প্রসঙ্গ উধৃতিতে এক ধরনের কাপট্য আছে যে কাপট্যের প্রতিবাদ প্রয়োজন। সাংখ্য কিংবা উপনিষদ ক্রিকেট বল নয়। তা হাঁকড়ালেই ওভার-বাউণ্ডারি করা যায় না।

কথা দাঁড় করাতে হয়। শান্তি বসু মহাশয়ের এই সব উধৃতিতে কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে তাঁর কোনো বক্তব্য নেই, তিনি কেবল নামজাদা হবার ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন।

অসীম রায়

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীধ্রুব গুপ্তের 'প্রতিবাদের প্রতিবাদ'-এর উত্তরে শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় একটি চিঠি আমাদের দপ্তরে পাঠিয়েছেন। চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন যে Link-এর সমালোচকের সঙ্গে নানা সময়ে এবং নানা প্রসঙ্গে তাঁর নানা লঘু-গুরু আলোচনা হয়েছিল, "কিন্তু তা নিশ্চয়ই অভিনেয় চরিত্র বা চলচ্চিত্রটি সম্পর্কে আমার মূল বক্তব্য নয়।" সে কারণেই, "পরিপ্রেক্ষিত-বিহীন সামান্য মুখের কথার" শ্রীগুপ্ত কর্তৃক এ প্রকার ব্যবহার তাঁকে বিস্মিত করেছিল।

শ্রীচট্টোপাধ্যায় তাঁর চিঠিতে লিখেছেন: "যে উক্তির ইতিহাস এই মৌখিক আলাপচারণা যা আমি নিজে কালিকলমে কখনও লিখি নি—যা 'নাকি' আমার, তাকে শ্রীগুপ্ত মহাশয় একজন দায়িত্ববান সমালোচক হিসেবে কেন আমার স্কন্ধে আরোপ করতে চান?" শ্রীচট্টোপাধ্যায় তাঁর চিঠিতে, তাছাড়া, Link-এ তাঁর বক্তব্য বলে যা প্রকাশিত হয়েছে, শ্রীগুপ্ত কর্তৃক তার বাঙলা অনুবাদের যাথার্থ্য সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

[শ্রীধ্রুব গুপ্ত-কৃত অভিযান চলচ্চিত্র সমালোচনা প্রসঙ্গে যে উত্তপ্ত বাদানুবাদ শুরু হয়েছে তাকে আমরা 'চায়ের পেয়ালায় তুফান' ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না। যাই হোক, এ-আলোচনার জের টানা আর বিধেয় হবে না বলেই আমরা মনে করি। সংশ্লিষ্ট বন্ধুবর্গের কাছেও আমাদের অনুরোধ আর যেন এ-বিতর্ককে জীইয়ে রাখা না হয়।

সম্পাদক, পরিচয়]

হিকমত-স্মরণে

একটি রুবাই

Kun-Minde bir gemi var teknesi taştan.
Yelkenleri rüzgâr dolu Çinde
bir o kımıldamıyor
bir o keder içinde.

[হিকমতের মূল তুর্কি]

কুনমিঙে আছে পাথরে তৈরি নৌকো এক।
সারা চীনে আর সমস্ত পালে পুরোদমে লাগে যখন হাওয়া
পড়ে থাকে শান-বাঁধানো মাটিতে শুধু সেই এক নৌকো
ম্লান মুখ, সারা অঙ্গ বিষাদে ছাওয়া।

অনুবাদ—সুভাষ মুখোপাধ্যায়

হেলসিঙ্কিতে সাক্ষাৎকার

কথায় কথায় তাঁরই কাছে শুনলাম যে নাজিম হিকমত নাকি এসেছেন, সম্ভবত এই ঘরেই হয়তো কোথাও তিনি আছেন আর তারপর আমার প্রবল কৌতূহল দেখে খাবার ছেড়ে উঠে বললেন, 'চলো তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।' এধার-ওধার খুঁজে নাজিম হিকমতের টেবিলে গিয়ে রিউই অ্যালি আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি হচ্ছেন ভারতবর্ষের প্রতিনিধি। তোমার সঙ্গে আলাপ করবার বড় আগ্রহ এঁর।' হতবাক হয়ে অর্থহীন প্রশ্ন করলাম আমি, 'আপনিই নাজিম হিকমত?' কবি বুকে হাত দিয়ে সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে জানালেন ঠিক ধরেছি। তারপর দৌড়ে গিয়ে একজন দোভাষী ডেকে আনলেন, কারণ কবি ফরাসি বলেন, ইংরেজি জানেন না।

আসলে নাজিম হিকমতকে দেখে হতবাক হওয়ার কারণ আছে। হিকমত অত্যন্ত সুপুরুষ। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ। ইওরোপীয়দের মতো গায়ের রং। নিখুঁত মুখশ্রী ছাপিয়ে ফুরতিতে উজ্জ্বল একজোড়া চঞ্চল নীল চোখ। আর সবার উপরে পাঁচ মিনিটের আলাপেই নজরে পড়ে তাঁর প্রবল প্রাণশক্তি। আমি যখন জানালাম যে আমাদের দেশে তাঁর খ্যাতির প্রসার ক্রমেই বেড়ে চলেছে আর আমাদের বাঙলা দেশে তাঁর কবিতার বই-এর অনুবাদ হয়েছে তখন খুশির চোটে তিনি এমন কষে আমার হাত টিপলেন যে আঙুলগুলো মড়মড় করে উঠল। তারপর বললেন একটি হলদে মলাটের বই তিনি কিছুদিন আগে পেয়েছিলেন, সম্ভবত সেটাই তাঁর বই-এর বাঙলা তর্জমা। 'কিন্তু বলো দেখি তোমাদের দেশে কি লেখা হচ্ছে?'

হিকমতের কথাবার্তা হাত-পা নাড়ার ভঙ্গি এমন প্রাণোচ্ছল ও মজলিশি যে নিমেষের মধ্যে অন্য মানুষেরও জড়তা বা ভয়ডর কেটে যায়। তাঁর অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠা সম্ভব হয়। আমি পাঁচ মিনিটের আলাপের পরই তাঁর কাছে 'পরিচয়'-এর জন্য কবিতা দাবি করলাম, কিন্তু অপ্রকাশিত কবিতা হওয়া চাই। তিনি মাথা নেড়ে জানালেন, 'নিশ্চয়, একটা রুবাই দেব, তুর্কি রুবাই।' চীন ভ্রমণের সময়ে একটি পাথরের তৈরি জাহাজ দেখে লেখা চার লাইনের কবিতাটি এই সংখ্যা পরিচয়-এই ছাপা হয়েছে। রোমান হরফে তুর্কি ভাষায় কবিতাটি লিখে তাঁর তুর্কি বন্ধু ও দোভাষীর সাহায্যে তিনি সেটিকে ইংরেজিতে তর্জমা করিয়ে দিলেন।

প্রশ্রয় পেয়ে আমি একদিন একটা চরম দুঃসাহসের কাজ করে বসলাম।

ভাবলাম নাজিম হিকমত তো এককথায় একটা কবিতা দিলেন। এর একটা ঠিকমতো প্রতিশোধ নেওয়া দরকার। সুভাষের 'সুন্দর' কবিতাটি আমার ভারি পছন্দ। স্থির করলাম তর্জমা করে কবিকে ঐটেই দেব। বিজ্ঞবুদ্ধি বারবার বাধা দিল। কবিতা তর্জমা শুধু কবিই করতে পারে। তর্জমাকারের দু-ভাষায় সমান দখল থাকা আবশ্যিক—আর সব থেকে গোড়ার কথা কবিতাটি পুরোপুরি মনে আছে কিনা জানিনা—শুধু তার ইমেজগুলোই মাথায় নাচছে। কিন্তু হিকমতের সংক্রামক বেপরোয়াপানা তখন আমায় পেয়ে বসেছে। মন থেকে যতটা উদ্ধার করা যায় তাই তর্জমা করে পা বাড়ালাম কবির ঘরের দিকে।

কবি কাজ করছেন। টেবিলের পরে স্তূপাকার কাগজপত্র। পাশে দোভাষী তুর্কি বন্ধুও কাজে ব্যস্ত। এমন সময় মূর্তিমান বিঘ্নের মতো আমি ঢুকে জানালাম, 'কবিকে বলো, পাঁচ মিনিট সময় চাই।' হিকমত চোখ তুলে, ঈষৎ ভুরু কুঁচকে বললেন, 'পাঁচ মিনিট কেন?' আমি বললাম, 'কবিতা শোনাবার জন্য।' আমার কথাটা ভাষান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কবি এক কাণ্ড করলেন। হাত দিয়ে সমস্ত কাগজপত্র দূরে হটিয়ে, মৌজ করে বসে বললেন, 'For poetry not five minutes, but eternity.'

কবিতা পড়ছি, দোভাষী বন্ধু তুর্কিতে তর্জমা করছেন—হিকমত মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছেন আর তুর্কিতে কি যেন সব বলছেন। কবিতা শেষ হওয়ার পর দোভাষী-বন্ধু বললেন, 'মহৎ কবিতা এটি।' আমি জানতে চাইলাম এটা কার মত, তাঁর না হিকমতের? দোভাষী বললেন, 'আমি হিকমতের কথারই তর্জমা করলাম। তবে আমিও নিশ্চয়ই এ-বিষয়ে একমত।' তারপর বললেন, 'হিকমত আপনার কাছে একটা অনুমতি চাইছেন—আপনার এ-কবিতা তুর্কিতে ও সম্ভব হলে রুশে অনুবাদের অনুমতি।' আমি বললাম, 'হিকমত অনুবাদ করতে চাইছেন এতে আর কথা কি! তবে কবিকে বলো এ-কবিতাটি আমার নয়, সুভাষের অর্থাৎ বাঙলা ভাষায় তাঁর কবিতার অনুবাদকের।' শুনে হিকমত আবার বুকে হাত দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে বললেন, 'তবে তো এখানে আনন্দের সঙ্গে কর্তব্যপালনের মিল হয়ে যাবে। তিনি তাঁর ভাষায় আমার কবিতা তর্জমা করেছেন, আমি আমার ভাষায় তাঁর কবিতা অনুবাদ করব।'

চিন্মোহন সেহানবীশ

"সেই শিল্প···যা জীবন সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা দেয় না"

কবি নাজিম হিক্‌মত শুধু তুরস্কের নন, তাঁর বিপ্লবী-কাব্যের উত্তরাধিকার সারা পৃথিবীর, এবং তাঁর ব্যক্তিত্বও। রুশের কবি-বিপ্লবী মায়াকভ্‌স্কির সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ এতই আত্মিক। আর, আজ বাংলা কবিতাতেও হিক্‌মত-এর কণ্ঠস্বর একান্ত প্রিয়জনের, অতি-পরিচিতের, নিকট-মানুষের।

তাঁর স্বদেশের ভূভাগ ছাড়িয়ে কবি নাজিম হিক্‌মত-এর ভূগোল যখন হয়ে যায় সত্যই সারা বিশ্ব, তখন বিশ্ব-নাগরিক এই কবি স্বভাবতই এসে দাঁড়ান সেই মঞ্চে যেখান থেকে পৃথিবীর সর্বদেশের শিল্পী, বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী আর অগণ্যসাধারণ বলে ওঠেন: আর, যুদ্ধ না। নাজিম হিক্‌মত-এর গলা সেখান থেকে শোনা যায়—বিশ্বশান্তির জন্য সংগ্রামী-পুরোযায়ীদের একজনের গলা—যার ঢেউ সারা পৃথিবীতে প্রতিধ্বনি তোলে। আধুনিক তুরস্কের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি, বিপ্লবী, কমিউনিস্ট হিক্‌মত বিশ্বশান্তির আন্দোলনে অগ্রগামীদের সারিতে তাঁর যথাযোগ্য স্থানে এসে দাঁড়ান।

বার্লিন যুব-উৎসবে কবি হিক্‌মত উপস্থিত। সে সময়ে এক সাক্ষৎকারে তিনি বলেছেন এই কথাই: "আমার সামনে একটিমাত্র লক্ষ্য আমার দেশবাসীর স্বাধীনতা। আমি তার জন্যে সমস্ত উপায়ে লড়াই করেছি—কখনও শান্তিকংগ্রেসে যোগ দিয়ে, কখনও বে-আইনী আন্দোলনে অংশ নিয়ে, কখনও জেলে গিয়ে, কখনও কবিতা লিখে।"

রাজরোষ তাই এই কবি ও বিপ্লবীর জীবনকে কোনোদিন সহজবিশ্রামে বসে রচনার অবসর দেয় নি। সংগ্রামীর জীবনকে তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করেছিলেন। তাঁর জীবৎকালে বিভিন্ন অভিযোগে হিক্‌মতের যে সাজা হয়েছে তার একত্রিত যোগফল কষলে দাঁড়াবে ৫৬ বছর। আর মৃত্যুকালে কবির বয়স হয়েছিল ৬১।

দীর্ঘ তেরটি বছর স্বদেশে শাসকদের দণ্ডাদেশে কারাবাসের পর, পৃথিবীর চারদিক থেকে তাঁর মুক্তির দাবি জোরালো হয়ে উঠলে, অসুস্থ কবি মুক্তি পান। তারপর তিনি চলে যান রুশদেশে এবং গত বছর সোভিয়েত নাগরিকত্ব লাভ করেন। আর, এবছর—হিক্‌মত নিলেন চিরবিদায়। একবার আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছিলেন: "আমার ঠাকুর্দা ছিলেন একজন পাশা, বাবা ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ, আর নিজে হলাম কমিউনিস্ট।" তুরস্কে হিক্‌মতের দণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছিল সৈন্যদের আইন অমান্য করাতে প্ররোচিত

করার অভিযোগ খাড়া করে ; আর, কমিউনিজমের প্রচার—তুর্কীর কর্তৃপক্ষের চোখে সেও তাঁর এক অপরাধ !

কর্মময়, বিপ্লবব্রতী কবি, কিন্তু, অবিরাম সৃষ্টিকর্মে নিরত থেকে গেছেন। শিল্পই তাঁর জীবনের, সংগ্রামের, উৎস। লিখে চলেছিলেন যখন বাইরে তখন, যখন জেলে, অন্তরালে, তখনও। লেখনীকে ক্ষান্তি দেন নি, না নিজেরও জন্য ক্ষান্তি।

হিক্‌মতের শিল্পসৃষ্টিতেও এই সক্রিয়, সংগ্রামশীল, জীবনের রূপান্তরসাধনে-রত জীবনবোধেরই প্রকাশ। এই-ই তাঁর 'কমিটমেণ্ট'। তাঁর শিল্প সম্পর্কে অভিমতও তাই : "সেই শিল্পই খাঁটি শিল্প, যার দর্পণে জীবন প্রতিফলিত। সেই হচ্ছে খাঁটি শিল্প যা জীবন সম্পর্কে মানুষকে মিথ্যা ধারণা দেয় না।"

এই নতুন কবিতার আঙ্গিক কি হবে? হিক্‌মত তাও বললেন : "কবিতার, গদ্যের আর কথা বলবার ভাষার ভিন্নতা নতুন কবি স্বীকার করেন না। এমন এক ভাষায় তিনি লেখেন—যা বানানো নয়, কৃত্রিম নয়, সহজ, প্রাণবন্ত, বিচিত্র, গভীর, একান্ত জটিল—অর্থাৎ অনাড়ম্বর সেই ভাষা। সে ভাষায় উপস্থিত থাকে জীবনের সমস্ত উপাদান।"

হিক্‌মতের নিজের রচনাবলীই শিল্প সম্পর্কে তাঁর এই মতামতের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ। হিক্‌মতের কবিতাকে স্পর্শ করলে মনে হয় তাই একটা গোটা মানুষকে স্পর্শ করলাম,—আনন্দ, বেদনা, সুখ, দুঃখ, প্রেম, বিদ্রোহ সর্বসমেত একটি অপূরণীয় সত্তা।

সারাজীবনে তিনি লিখেছেন অজস্র, যা শুধু কবিতাবলীই নয়, একাধিক মহাকাব্যই নয়—নাটক, শ্লেষমূলক রচনা, ভ্রমণ-কাহিনী, চিত্রনাট্য, সাংবাদিক-সাহিত্য। এই সম্প্রতি, খবরে দেখলাম, মস্কোতে তাঁর উপন্যাস প্রকাশের কথা। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যা সোভিয়েত পাঠকদের মধ্যে অসামান্য জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই উপন্যাসটির নাম কবি দেন "রোমান্স"। নির্যাতিত মানুষের শৃঙ্খলমুক্তির জন্য সংগ্রামের কাহিনী। এরই নাম "রোমান্স"। এই হলেন হিক্‌মত।

"এশিয়ার অনেক দেশের একটি দেশ
ভারতবর্ষ,
ভারতবর্ষের অনেক শহরের একটি শহর
কলকাতা,
সেই কলকাতার একটি মানুষ
বাঁড়ুজ্যে"—

তুর্কীর কবি-বিপ্লবীর বিশ্ববোধে আমাদের এই শহর-কলকাতা ও তার এক বিপ্লবী মানুষ "বাঁড়ুজ্যে"র কথা তাই এমন অনায়াস-স্বাভাবিকত্বে, সহজ-দরদে এসে পড়ে। তাঁর যে তিনটি মহাকাব্যের কথা আমরা জানি তার একটি হল এই কলকাতার একজন বিপ্লবীকে মনে করে, নায়ক-চরিত্র করে লিখিত—"বাঁড়ুজ্যে কেন খুন হলেন" নামক মহাকাব্য। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঔপনিবেশিক দেশের মুক্তি-আন্দোলনের প্রতীক-চরিত্র নিয়ে মহাকাব্য। আর দুটি মহাকাব্যে তাঁর স্বদেশের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসের নায়কদের কথা—"আহম্মদ ড্রাইভার", "শেখ বদরুদ্দীনের মহাকাব্য"। "শেখ বদরুদ্দীন" তুরস্কের অতীত যুগের এক গণ-বিদ্রোহের নায়ক। এই নায়ক আদিম সাম্যবাদী সমাজের আদর্শের অনুপ্রেরণায় অভ্যুত্থান করেন। সেকালের তুর্কী শাসকশ্রেণীর কোপে ফাঁসীর রজ্জু গলায় নেন।

আমাদের সৌভাগ্য ঘটেছিল হিক্‌মতের সঙ্গে 'পরিচয়'-এর প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সুযোগ হয়ে যাওয়ায়। এ কাহিনী এই সংখ্যাতেই অন্যত্র বিবৃত হয়েছে। হিক্‌মত 'পরিচয়'-এর জন্য পাঠিয়েছিলেন তাঁর মাতৃভাষায় স্ব-হস্তাক্ষরে লিখিত একটি "রুবাই"। তাঁর হস্তাক্ষরের প্রতিলিপিসহ সেই "রুবাই"-এর অনুবাদ (কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়-কৃত) ও হেলসিঙ্কি শান্তি-কংগ্রেসে কবি হিক্‌মতের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণী (শ্রীচিন্মোহন সেহানবীশ লিখিত) পুরনো 'পরিচয়'-এর পাতা থেকে এই দুটি লেখাই এই সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হল। শ্রীসেহানবীশের কাছেই শুনেছি হিক্‌মত তাঁর নাম স্বাক্ষর করতেন, কেউ অটোগ্রাফের খাতা এগিয়ে দিলে—তাঁর নামের আদ্যাক্ষর, শুধু ডাকনাম "নাজ" মাত্র এইটুকু লিখে। কবির ব্যক্তিত্বে এ এক সহজ-মানুষ এইটুকু উল্লেখের মধ্য দিয়েই যেন আমাদের কাছে ধরা দিয়ে যান।

হিক্‌মতের একটি অনন্দিত কবিতাও আমি এই সঙ্গে তর্জমা করে দিলাম। কবিতাটি ছোট, কিন্তু 'নাজিম হিক্‌মত' বললে আমাদের বোধের জগতে যে কবির উপস্থিতি একমুহূর্তে অনুভবনীয় হয়ে ওঠে, এই কয়েক পঙ্‌ক্তি কবিতা যেন তার অনতি-পরিসর অস্তিত্বে তার সবটুকুই বয়ে নিয়ে আসে। ইয়োরেশিয়ার মানচিত্রের যে কোণাটুকুতে তুরস্ক নামক কবির স্বদেশের অবস্থান সেইটুকু মনে থাকলে এবং কবির জীবনদর্শন ও এই আমাদের পৃথিবী-নামক গ্রহটিতে এক শোষণমুক্ত মহামানব-পরিবারের জন্য কবির

ভবিষ্যৎ-স্বপ্নটির হাতে কিছুক্ষণ ধরা দিতে পারলে এই ছোট্ট কবিতাটিরও আবেদন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে :

ওজর

এই দেশ যেন দেখতে বা এক বাঁকানো ঘোড়ার মাথা
দূর এশিয়ার থেকে দিলে জোর দৌড়, কদম উঁচিয়ে
বাড়িয়ে যে দিতে গলা, ভূমধ্যসাগরে
আমাদের এই দেশ

রক্তে-ভিজছে কব্জি, দাঁতে-চেপে রেখে দাঁত
খালি পায়
জমি পড়ে থাকে দামী সিল্কের জাজিম
এই নরক, এ-স্বর্গও আমাদের
অন্যেরা দিক সদরে হুড়কো-কপাট
যেন না খোলে তা, আবার
মানুষের হাতে মানুষের এই বাঁধনের দিন, কাবার হোক
এই আমাদের ওজর
বাঁচবার ! গাছেদের মতো মাথা তুলে একা, স্বাধীন
ভাইভালোবাসা মিলেমিশে এক মস্ত বন
এই তো ইচ্ছা আমাদের, বেগবান।

সিদ্ধেশ্বর সেন

সম্পাদকীয় নিবেদন

পরিচয়-এ প্রকাশিত স্বাক্ষরিত সমস্ত রচনার দায়দায়িত্ব একান্তভাবেই লেখকের। যে কোনো পত্রিকার ক্ষেত্রেই এইটা সাধারণভাবে স্বীকৃত নীতি। তবু নতুন করে এই নীতি ঘোষণার প্রয়োজন হল এই কারণে যে পরিচয়-এ ইদানীং কিছু বিতর্কমূলক রচনা প্রকাশিত হচ্ছে (এই সংখ্যাতেই শ্রীসতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রবন্ধটি খুবই বিতর্কমূলক)—সেই প্রসঙ্গে এই কথাগুলি মনে না রাখলে ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ ঘটতে পারে।

'পরিচয়' মনে করে মুক্ত আলোচনা ও বিতর্কের মধ্য দিয়েই সত্যে পৌছান সম্ভব। সেই কারণেই বিতর্কমূলক রচনা প্রকাশ করতে 'পরিচয়' আগ্রহী। প্রকাশিত প্রত্যেকটি রচনার সমর্থনে বা খণ্ডন করে যা লেখা হবে তাও ঐ কারণে প্রকাশ করতে পরিচয় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পরিচয়

বিশেষ সমালোচনা সংখ্যা

লিখছেন :

নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ
সুশোভন সরকার
সরোজ আচার্য
হিরণকুমার সান্যাল
বিনয় ঘোষ
সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়
দেবীপদ ভট্টাচার্য
অমল দাশগুপ্ত
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
তরুণ সান্যাল
সিদ্ধেশ্বর সেন
সুনীল সেন
চিন্মোহন সেহানবীশ
অশোক রুদ্র
দিলীপ বসু
শঙ্কর চক্রবর্তী

●

আগামী শ্রাবণ সংখ্যা পরিচয় অন্যান্য বছরের মত এবারও বিশেষ সমালোচনা সংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে। দেশে এবং বিদেশে যে সব বই আলোড়ন তুলেছে বাংলাদেশের নবীন ও প্রবীণ সমালোচকেরা এই সংখ্যায় তার সম্যক আলোচনা করবেন।

●

বর্ধিত কলেবর

এই সংখ্যাটির দাম হবে

॥ দেড় টাকা ॥

●

লিখছেন :

প্রদ্যোৎ গুহ
চিত্তরঞ্জন ঘোষ
রাম বসু
ভবানী সেন
রবীন্দ্র মজুমদার
সব্যসাচী ভট্টাচার্য
গৌতম চট্টোপাধ্যায়
শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়
শান্তি বসু
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়
অমিয়ভূষণ চক্রবর্তী
শান্তিময় রায়
দেবেশ রায়
যুগান্তর চক্রবর্তী
সুজয় মিত্র
শিপ্রা সরকার
কুশল লাহিড়ী

পরিচয়-এর এইটি চতুর্থ সমালোচনা সংখ্যা। গত তিনটি সমালোচনা সংখ্যাই প্রকাশমাত্র নিঃশেষিত হয়ে গেছে। ফলত অনেক খুচরো ক্রেতাই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে পারেন নি। এবার যেন পূর্বাহ্নেই তাঁরা সংখ্যাটি সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন।

গ্রাহকদের কোনো বিশেষ সংখ্যার জন্যই অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না

পরিচয়-এর সব সংখ্যা নিয়মিত পেতে হলে গ্রাহক হওয়াই শ্রেয়

গ্রাহক চাঁদা

বার্ষিক : **দশ টাকা** ষাণ্মাসিক : **সাড়ে পাঁচ টাকা**